ভারতের লোক সমষ্টি—সমগ্র ভারতবর্ষে গত ১৮ই মার্চ্চ তারিখে যে প্রাথমিক লোক গণনা লইয়াছে তাহাতে ভারতের লোক সমষ্টি ৩১,৯০,০০,০০ বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে ১৯১১ সালের লোকগণনায় লোক সমষ্টি ৩৯,৪১,৫০ হইয়াছিল। বোম্বে, যুক্তপ্রদেশ ও বিহার এবং উড়িষ্যা প্রদেশে মোটের উপর লোকসংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের লুপ্ত গৌরব রক্ষার চেষ্টা।

(প্রাপ্ত)

[কবিরাজ শ্রীনরেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি]

কয়েক বৎসর ধরিয়া কতিপয় আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্মনীষি কিরূপে আয়ুর্ব্বেদের লুপ্ত গৌরব রক্ষিত হয়, তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু কোন্ পথে চলিলে সেই কার্য্যসিদ্ধ হইবে, তৎসম্বন্ধে বিলক্ষণ মতভেদ রহিয়াছে। কেহ কেহ বলিতেছেন যে, শারীর পরিচয়, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি পাশ্চাত্যরীতি অনুযায়ী শিখাইয়া লইয়া পরে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া উচিত। কাহারও মতে একই সময়ে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শারীর পরিচয় ও পদার্থ বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া উচিত। কেহ কেহ বলিতেছেন—আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রই আমরা পড়াইব, তবে শারীর পরিচয় শবব্যবচ্ছেদ দ্বারা শিখাইব, নচেৎ আমাদিগের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইবে না। প্রথমে যে দ্বিবিধ মতের কথা বলিলাম, তাহা হাতে কলমে হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের গৌরব কতদূর রক্ষিত হইতেছে তাহার বিচার করিবার সময় এক্ষণে আসিয়াছে এবং সে বিচারের ভার আমি পাঠক মহোদয়গণের উপর দিলাম। শেষোক্ত মতাবলম্বী মহোদয়গণ এখনও কার্য্যারম্ভ করেন নাই, সুতরাং তাহার ফলের সম্বন্ধে এখন কথা কহিবার সময় নহে। তবে আমি কয়েকটী বিষয়ে সহৃদয় পাঠকবর্গের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা করিতেছি।

বৈদ্যজাতির গৌরবস্তম্ভ স্বর্গীয় মহাত্মা গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয়ের আবির্ভাবের পূর্ব্বে আয়ুর্ব্বেদের গৌরব ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল; তাঁহারই চেষ্টায় আয়ুর্ব্বেদের পুনরুন্নতি হয়। তিনি যে যে পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা প্রাচীন সদ্বৈদ্য মহোদয়গণের অজ্ঞাত নাই। তিনি যে শবব্যবচ্ছেদাদি পাশ্চাত্য পদ্ধতির অনুশীলন ব্যতীতই আয়ুর্ব্বেদের গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

দেশ ভেদে ব্যবস্থা ভিন্নই হইয়া থাকে, এক দেশে যে পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া সুফল হইয়া থাকে; অন্য দেশে সেই পদ্ধতিতেই কুফল হইয়াছে। পূর্ব্বে আমাদের দেশে ছাত্রেরা অধ্যাপককে পিতার ন্যায় ভক্তি করিত; এক্ষণে ইংরাজীর প্রভাবে স্কুল কলেজে

সেই ভক্তির কতকটা হ্রাস হইয়াছে, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। কয়েক বর্ষ পূর্ব্বে আইন কলেজে, যেখানে ছাত্র ও অধ্যাপক উভয় সম্প্রদায়ই শিক্ষিত (গ্রাজুয়েট) সেইখানেই পরস্পরের মধ্যে কিরূপ ব্যবহার ঘটিয়াছিল। এই দেখিয়াই এক্ষণে বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর উপর সকলে কত দোষ দিতেছেন; যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদের গৌরব রক্ষা কল্পে কলেজের অনুকরণে বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠার উদ্যোগী, তাঁহারা কি এই বিষয়টী ভাবিয়া দেখিবেন? সংস্কৃত শিক্ষার উন্নতি কল্পে টোলের পরিবর্ত্তে সংস্কৃত কলেজ অধিক কার্য্য করিতে সক্ষম হইয়াছে এ কথা কোন শাস্ত্র পারদর্শী পণ্ডিত মহোদয় কি স্বীকার করিয়া থাকেন? এই সব দেখিয়া শুনিয়াও কি স্বর্গীয় মহাত্মা গঙ্গাধর কবিরাজ মহোদয় প্রদর্শিত পথ ত্যাগ করা সমীচীন বলিয়া মনে হয়? দুরূহ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রগ্রন্থের টীকা প্রণয়ন, আর্থিক ক্ষতিস্বীকার করিয়াও ছাত্রদিগকে বিদ্যাদান, নাড়ীজ্ঞান লাভে ছাত্রদিগকে সুশিক্ষিত করা, প্রলেপ ঔষধাদি প্রয়োগে শস্ত্রচিকিৎসাসাধ্য বা শস্ত্রচিকিৎসার সাধ্যাতীত ব্রণ আরোগ্য করা প্রভৃতি তাঁহার প্রদর্শিত পথ তাঁহার মত কয়জন নির্লোভভাবে অনুসরণ করিতে সক্ষম হইতেছেন? অথচ শাস্ত্রে ও ধর্ম্মে দৃঢ় ভক্তিসম্পন্ন পণ্ডিত ব্যক্তিমাত্রেরই এই পথ সাদরে অবলম্বনীয়। স্বর্গীয় মহাত্মা গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয় বহু শস্ত্রচিকিৎসা-সাধ্য এবং শস্ত্রচিকিৎসার অতীত ব্রণ আরোগ্য করিয়াছেন, তাহা আমি তৎসাময়িক বহরমপুরের অ্যাসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ডাক্তার বাবুর মুখে শুনিয়াছি।

যাঁহারা আজ কাল আমাদের দেশের মধ্যে পাণ্ডিত্যে ও চিকিৎসা নৈপুণ্যে যশস্বী, তাঁহাদের ছাত্রদিগকে তাঁহারা যদি তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের ন্যায় নাড়ীজ্ঞানে দক্ষ ও কায়চিকিৎসায় নিপুণ করিয়া দেন, তাহা হইলেই আয়ুর্ব্বেদের লুপ্ত গৌরব রক্ষিত হয়। নাড়ীজ্ঞানে পূর্ব্বপুরুষদিগের ন্যায় এই কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, প্রাচীনতম চিকিৎসকেরা নাড়ী দেখিয়াই, সেটি সাধ্য কি অসাধ্য তাহা নিরূপণ করিয়া দিতে পারিতেন এবং সেইরূপ চিকিৎসক যে সর্ব্বত্র আদৃত হইতেন, তাহাতে কোন সংশয় নাই। এই নাড়ীজ্ঞান বিদ্যা আর কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে এইভাবে প্রচলিত নাই।

আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে গবেষণা করিতে যদি ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে রসতন্ত্রে বিভিন্ন উপায়ে রস শোধন বর্ণিত হইয়াছে; তাহার মধ্যে কোন্ উপায়টী সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তাহা পরীক্ষা দ্বারা অর্থাৎ ঔষধার্থ প্রয়োগ করিয়া নির্ণয় করিয়া দিতে পারেন। মহাত্মা চক্রপাণি দত্ত যেরূপ নানাপ্রকার ঔষধাদি প্রয়োগ করিয়া সিদ্ধফল যোগ, ঘৃত, তৈলাদি তাঁহার সংগ্রহের মধ্যে স্থান দিয়া বৈদ্যদিগের মহোপকার সাধন করিয়াছেন; সে পথ কি অনুসরণীয় নহে? যাঁহারা বৈদ্যগণের মুকুটমণি, যাঁহাদের আর্থিক অবস্থা বড় বড় ডাক্তারগণের ঈর্ষার বিষয়, তাঁহারা এ বিষয়ে অগ্রসর হউন। দারিদ্র্য জন্য পরিবার বর্গের গ্রাসাচ্ছাদন অতিক্লেশে সংগ্রহণশীল বৈদ্য দ্বারা সে কার্য্য সাধিত হওয়া কি সম্ভবপর? কতকগুলি সুন্দর কল্পনা দ্বারা চালিত হইয়া নূতন পথে অগ্রসর হওয়া অপেক্ষা এই পথ কি অবলম্বনীয় নহে?

জগতে কোন রীতি বা পদ্ধতি সর্ব্বপ্রকারে দোষশূন্য নহে; সেইরূপ আমাদের দেশে যে সকলকারই জাতিগত ব্যবসায় ছিল, তাহাও অনেক গুণের আকর হইলেও যে দোষশূন্য তাহা আমি মনে করি না। তবে একথা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন যে, বর্ত্তমানকালে ইংরাজী শিক্ষার সংশ্রবে আসিয়া জাতিগত ব্যবসায় ভুলিয়া আমরা অধিকাংশ লোকই কষ্ট পাইতেছি, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমরা দেশের উন্নতি করিতে চাহিতেছি; কিন্তু দেশের যাহা যাহা ভাল ছিল, সবই যদি উড়াইয়া দিই, তাহা হইলে কি আর থাকিবে, আমরা কিসের উন্নতি করিব? জাতিগত ব্যবসায় ও গুরুশিষ্য সম্বন্ধ প্রভৃতি ত ইংরাজীর কল্যাণে উঠিতে বসিয়াছে। এ অবস্থায় যে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ইংরাজী ভাবের কোন প্রয়োজন নাই, তাহাতে ইংরাজী ভাব অন্তর্নিহিত করিয়া কি আমরা উন্নতি করিতে পারিব? এই জন্যই বলিতেছি—পুরাতন উপায়ে যদি এই পরম পুরাতন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের উন্নতি করিবার চেষ্টা হয়, তাহা হইলেই ইহার উন্নতির সম্ভব। নচেৎ ইংরাজী উপায়ে উন্নতি করিতে গিয়া আমরা যাহা ভাল ছিল, তাহাও হারাইয়া ফেলিব। যদি আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির জন্য প্রাণে ব্যাকুলতা আসিয়া থাকে, তাহা হইলে সন্দিগ্ধভেষজ নির্ণয়ের চেষ্টা হউক, একটী আদর্শ ভেষজ উদ্যান প্রতিষ্ঠিত হউক, নিত্য বহু প্রকার ধাতুভস্ম হইতেছে এইরূপ একটী রসশালা প্রতিষ্ঠিত হউক। সর্ব্বজন মান্য পণ্ডিত চিকিৎসকগণ তাঁহাদের ছাত্রদিগকে উত্তমরূপে শিক্ষা দিয়া তাঁহাদের যোগ্যতার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে সক্ষম হইলে, যেন তাঁহাদিগকে চিকিৎসা করিতে অনুমতি দেন। চিকিৎসাশাস্ত্র উত্তমরূপে অধ্যয়ন, নাড়ীজ্ঞানে অধিকার লাভ এবং ভালরূপে ঔষধ প্রস্তুত করিতে পারদর্শী হওয়া, এই তিনটিই যে আয়ুর্ব্বেদ-চিকিৎসকগণের প্রধান গুণ,—এ কথা বোধ হয় বলিতে হইবে না।

এখনকার দিনে উন্নত পদ্ধতিতে মেডিক্যাল কলেজে পড়িয়া যাঁহারা ডাক্তার হইয়াছেন, তাঁহাদের উপেক্ষা করিয়া, সামান্যরূপ অ্যানাটমীশাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করিয়াছেন এইরূপ কবিরাজ মহাশয় দ্বারা যে শল্যচিকিৎসা লোকে করাইবে, এ বিশ্বাস আমার নাই। সুশ্রুত সংহিতার একটী উত্তম সংস্করণ যদি কোন বিজ্ঞ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক মহোদয় টীকার সহিত সম্পাদন করিয়া দেন, তাহা হইলে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের পঠন-পাঠনের সুযোগ হইবে। স্বর্গীয় মহাত্মা গঙ্গাধর কবিরাজ মহোদয় প্রদর্শিত পথ ত ইহাই। আমরা পুরাতন শাস্ত্র নাড়াচাড়া করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করি, তাই পুরাতন সোণার গহণার জৌলুষ কমিয়াছে বলিয়া আপাততঃ চাকচিক্যশালী ডাকের গহনায় পাছে ভুলি, তাই এত কথা লিখিলাম।*

* এই প্রবন্ধের লেখক যে প্রণালীতে আয়ুর্ব্বেদের পুনরুন্নতির পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার সহিত আমাদের একেবারেই মিল নাই, কারণ প্রবন্ধ লেখকের অভিপ্রায় আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক প্রস্তুত করিবার জন্য শল্য চিকিৎসার শিক্ষায় Practical শিক্ষা দিবার

বিবিধ প্রসঙ্গ।

—:*:—

আয়ুর্ব্বেদে সার্জ্জারি।—আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় যে শল্যকর্ম্ম বা সার্জ্জারির বিশেষ প্রচলন ছিল, সুশ্রুত সংহিতাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। মহর্ষি সুশ্রুত একজন পাকা সার্জ্জন বা শল্যকর্ম্মবিদ্ সুনিপুণ চিকিৎসক ছিলেন। মহর্ষি আত্রেয় প্রবর্ত্তিত চিকিৎসায় শল্যকর্ম্মের ব্যবস্থা ছিল না, কিন্তু আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির যুগে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক মাত্রেই মহর্ষি আত্রেয় এবং সুশ্রুত উভয়ের প্রবর্ত্তিত পন্থানুসর করিয়াই চিকিৎসা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকদিগের সকল ক্ষেত্রে চিকিৎসায় সাফল্যসাধন তাহারই ফলসম্ভূত। আয়ুর্ব্বেদের ভাগ্যবিপর্য্যয়ে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকদিগের মধ্য হইতে শস্ত্রচিকিৎসা বিলয় প্রাপ্ত হইল, আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা অপেক্ষা পাশ্চাত্যচিকিৎসার সমুন্নতি লাভের ইহাই কারণ। লুপ্ত প্রায় আয়ুর্ব্বেদকে আবার জাগাইয়া তুলিতে হইলে এই সকল কথা প্রত্যেক বৈদ্য ব্যবসায়ীকে চিন্তা করিতে হইবে, এবং শুধু চিন্তা মাত্র নহে; আয়ুর্ব্বেদের নষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য বৈদ্য চিকিৎসার মধ্যে শল্য চিকিৎসা শিখাইবার ব্যবস্থা উত্তমরূপেই করিতে হইবে।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়।—কলিকাতার অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় এই উদ্দেশ্য লইয়াই পরিচালিত। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতাগণ এই উদ্দেশ্য বজায় রাখিবার জন্য এই বিদ্যালয়ে প্রথমেই শারীর স্থানের চিকিৎসা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিলেন। বহুকালাবধি শল্য চিকিৎসা বিসর্জ্জনকারী অনেক আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকদিগের তখন ইহা আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার্থিগণের পক্ষে বিশেষ শুভদ বলিয়া মনে হইল না। আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ে শল্যবিদ্ চিকিৎসকগণ শিক্ষাদান করিবেন—ইহা তাঁহাদের চক্ষে বিসদৃশ বোধ হইতে লাগিল এবং এই কারণেই অনেকে ইহার সহিত যোগদান করিতে ইচ্ছুক হইলেন না। কিন্তু যখন তাঁহারা বুঝিলেন যে, সত্য সত্য শল্য চিকিৎসার প্রচলন ভিন্ন আয়ুর্ব্বেদের পুনরুন্নতির আদৌ সম্ভাবনা নাই, তখন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই মত পরিবর্ত্তন হইল এবং অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রণালীর ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

পঠন-প্রণালী।—অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ে যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া শিক্ষা প্রদান করা হয়—তাহা প্রকৃত পক্ষে সুচিকিৎসক গঠনের

আদৌ প্রয়োজন নাই, উহার জন্য ভাল করিয়া সুশ্রুত সংহিতাই পড়ান হউক। কিন্তু গ্রন্থ অধ্যয়ন ভিন্ন শল্য তন্ত্রের শিক্ষা হাতে কলমে না করিলে যে একান্তই চলিতে পারে না তাহা কি আর বলিতে হইবে? মহাত্মা গঙ্গাধর প্রদর্শিত পন্থানুসরণ একান্তই কর্ত্তব্য, কিন্তু আয়ুর্ব্বেদকে সম্পূর্ণরূপে আবার জাগাইতে হইলে আয়ুর্ব্বেদের ভিতর শল্য চিকিৎসা-শিক্ষার প্রচলন অবশ্যই করিতে হইবে। শল্যবিদ্ আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ চিকিৎসকদিগের উপর Oparatior এর জন্য কেহ নির্ভর করিতে পারিবে না কেন, ইহা তো আমরা বুঝিতে পারিলাম না। ডাক্তারদিগের মধ্যেও সকলে তো শল্যকর্ম্মের জন্য সকল স্থলে আহূত হইতে পারেন না, এমন কি যাঁহারা শল্যকর্ম্মকুশল বলিয়া সুপরিচিত, তাঁহাদিগের উপর কায়চিকিৎসার ভার জনসাধারণ অর্পণ করেন না। শল্য বিদ্যা শিক্ষা করিয়া আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকদিগের মধ্যেও কেহ কেহ এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে তাহাতেও ক্ষতির কারণ তো কিছুই নাই। ফল কথা যে শারীর স্থানের চিকিৎসা কার্য্যের আমরা ভার গ্রহণ করিতেছি, তাহাতে সম্যকপ্রকারে জ্ঞানলাভ করা একান্তই কর্ত্তব্য। আ: সং।

পক্ষে যে নিশ্চয়ই সমীচীন, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। বৈদ্যদিগের মধ্যে কেহ শল্যকর্ম্ম নিপুণ নহেন, এইজন্য অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ে শল্যচিকিৎসা শিক্ষার ভার কৃতবিদ্য শল্য বিশারদদিগের উপর। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ একদিকে সুশ্রুতের মহামূল্য উপদেশাবলী তাঁহার রচিত সংহিতা হইতে শিক্ষা লাভ করিতেছে, অপরদিকে শল্যবিদ্ পাশ্চাত্য চিকিৎসক-দিগের নিকট হইতে আহৃত চিকিৎসার জ্ঞানার্জ্জনে এবং বিদ্যালয় সংলগ্ন আরোগ্যশালা বা হাসপাতালের চিকিৎসা শিক্ষায় দৃষ্টকর্ম্মা হইয়া স ।সত্যই চিকিৎসার সকল অঙ্গ শিক্ষা লাভ করিতেছে। গত বৎসর এই বিদ্যালয় হইতে ১৪টি ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়া চিকিৎসা কার্য্যে ব্রতী হইয়াছে। তাহাদের কয়েক জনের কৃতিত্বে সকলেই বিমুগ্ধ হইতেছেন। একই চিকিৎসক নাড়ী দেখিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিতেছেন, ফোড়া হইলে কাটিয়া দিয়া রোগীর রোগ-যন্ত্রণার প্রশমন করিতে-ছেন, প্রয়োজন মত প্রসবকার্য্যের উপায় করিতেছেন। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের শিক্ষালাভ ভিন্ন এরূপ কৃতিত্ব সম্ভবপর কি?

আশার কথা।—সত্যসত্য দেশের প্রাচীন কবিরাজমণ্ডলীর অনেকে এখন অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালীর উপকারিতা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছেন। তাহারই ফলে এই বিদ্যালয়কে আদর্শ করিয়া আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎ-সক প্রস্তুতের জন্য অনেকে মনোভি-নিবেশও করিয়াছেন। এইরূপ সদনুষ্ঠানে আয়ুর্ব্বেদের যুগ আবার যে ফিরিয়া আসিবে—ইহা নিশ্চয়ই আশা করিতে পারা যায়। আমরা পরম পিতা পরমেশ্বরের নিকটে সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করিতেছি—যাঁহারা এইরূপ সঙ্কল্প লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছেন তাঁহাদের সেই সদিচ্ছা কার্য্যে পরিণত হউক, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সমন্বয়ে আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি করিয়া তাঁহারা দেশে আবার চরক-সুশ্রুতের যুগ ফিরাইয়া আনিয়া বিশ্ববাসীকে অপূর্ব্ব সুধা বিতরণ করিতে সমর্থ হউন।

সাফল্য সাধন। গোঁড়ামিটা যে কার্য্য-সিদ্ধির উপায় নহে, তাহা তো অবিসংবাদিত। সফিল্য সাধন করিতে হইলে, প্রকৃত চিকিৎসক প্রস্তুত করিতে হইলে, আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার বর্ত্তমান কলঙ্ক চিকিৎসা-জগত হইতে অপ-সারিত করিতে হইলে—আমাদিগকে আর গোঁড়া আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসক বলিয়া প্রচার করিলে চলিবে না। আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থগুলির শিক্ষার সহিত শারীরস্থানের শিক্ষা লাভ করিয়া শল্যবিদ্যায় আমাদের জ্ঞানার্জ্জন করিতে হইবে। এই শল্য চিকিৎসায় ডাক্তারেরা এখন বিশেষ কৃতিত্ব লাভ করিলেও উহারও মূল যে আয়ুর্ব্বেদ—তাহাতে তো আর সন্দেহ নাই, কিন্তু আমরা যখন উহা অপরকে প্রদান করিয়া নিজেরা উহা ভুলিয়া গিয়াছি—তখন উহার পুনরুদ্ধারের জন্য যাহাদিগকে এ মহা-মূল্য সম্পত্তি আমরা প্রদান করিয়াছি, তাহাদিগেরই নিকট উহার শিক্ষালাভের ব্যবস্থা না করিলে উপায় কি? প্রথমতঃ আমাদিগকে সেইরূপ ব্যবস্থা করিতেই হইবে, তাহার পর উহা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া শিষ্যপরম্পরায় মধ্যে শিক্ষা বিস্তৃতির ব্য:স্থা করিতে হইবে। আয়ুর্ব্বেদে শল্য চিকিৎসার পুনরুদ্ধারের ইহাই প্রকৃষ্ট উপায়। আমরা যদি ইহার ব্যতিক্রম করি, তাহা হইলে আমাদগকে যে ঠকিতে হইবে—তাহা সুনিশ্চয়।

কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দাশ গুপ্ত কাব্যতীর্থ কর্ত্তৃক গোবর্দ্ধন প্রেস হইতে মুদ্রিত
ও ২৯নং ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট হইতে মুদ্রাকর কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

আয়ুর্ব্বেদ

৫ম বর্ষ । বঙ্গাব্দ ১৩২৮—আষাঢ় । ১০ম সংখ্যা ।

কঃ পন্থাঃ ?

বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং ।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং—
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।

বেদ সকলেরও ভিন্ন মত এবং স্মৃতিগুলির ও নানা মত। এজন্য ঐ সকল হইতে ধর্ম্মের তত্ত্ব স্থির করিতে না পারিয়া মীমাংসক বলিয়াছেন—মহাজনের পন্থানুসরণ করাই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য।

বর্ত্তমান সময়ে আয়ুর্ব্বেদীয় শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধেও আমাদের অভিপ্রায়—আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির জন্য অধুনা যাহাঁদের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতেছে, তাঁহারা নিজেরা কোন একটা মত সাব্যস্থ করিয়া না লইয়া আয়ুর্ব্বেদ অনুশীলনকারী মহাজনগণ এতদিন আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার জন্য যেপথ উত্তম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, সেই মার্গের অনুসরণ করাই তাঁহাদের পক্ষে কর্ত্তব্য। এখন সেই মার্গটি কি—তাহারই মীমাংসার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা।

লোক পিতামহ ব্রহ্মা আয়ুর্ব্বেদের আবিষ্কর্ত্তা। লক্ষ শ্লোকপূর্ণ তিনি যে সংহিতাখানির প্রথম আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহাই আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার মূল-সূত্র। আয়ুর্ব্বেদের প্রতি সংস্কারের জন্য নানা মুনি আমাদিগকে নানাপ্রকারে অনেক অমূল্য রত্ন দান করিয়াছেন, কিন্তু সকলগুলিই ব্রহ্মপ্রোক্ত আয়ুর্ব্বেদ সংহিতারই প্রতি সংস্কার। ব্রহ্মা যতগুলি শ্লোকে আয়ুর্ব্বেদের রচনা করিয়াছিলেন, তাহার সমুদয় পাওয়া যায় নাই; সেইজন্য এবং ব্রহ্মপ্রোক্ত সেই আয়ুর্ব্বেদ সংহিতা হইতে তাহারই বিশ্লেষণ করিয়া "প্রাণীজগতের কল্যাণের জন্য আয়ুর্ব্বেদসংহিতার" পরে ঋষিবৃন্দের অন্যান্য সংহিতা রচনা করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল।

ব্রহ্মার আয়ুর্ব্বেদ শিষ্য প্রজাপতি দক্ষ,

দক্ষ হইতে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, অশ্বিনীকুমারদ্বয় হইতে দেবরাজ ইন্দ্র আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা লাভ করেন এবং ইন্দ্রের নিকট মহর্ষি ভরদ্বাজ প্রথমে আয়ুর্ব্বেদের শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া এই বিদ্যা ধরণীতে প্রচার করেন,—ইহাই আয়ুর্ব্বেদের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে কিন্তু এই মতের একটু অন্যরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। উহাতে উক্ত হইয়াছে—ব্রহ্মা হইতে সূর্য্য আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন এবং তাহার ফলে সূর্য্যসংহিতা নামে একখানি গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। ভগবান ধন্বন্তরি এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয় সূর্য্যের শিষ্য। তাহার পর দিবোদাস, কাশীরাজ, নকুল, সহদেব, যমরাজ, চ্যবন, জনক, চন্দ্রসুত, জাবাল, জাজলি, পৈল, করথ ও অগস্ত্য প্রভৃতি অনেকে সূর্য্য প্রদর্শিত পন্থারই অনুসরণ করিয়া প্রকারান্তরে তাঁহারই শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন।

ফলে ধন্বন্তরি প্রভৃতি সূর্য্য হইতেই আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করুন, আর দক্ষ প্রজাপতি হইতেই শিক্ষালাভ করুন, আয়ুর্ব্বেদের আদি শিক্ষাগুরু লোকপিতামহ ব্রহ্মা। আয়ুর্ব্বেদের প্রতিসংস্কার করিয়া যখন যিনি যে ভাবেই ইহার বিশ্লেষণ করুন—সে ব্রহ্মা বিরচিত ব্রহ্মসংহিতারই ব্যাখ্যান মাত্র, ব্রহ্মসংহিতাকে আদর্শ করিয়া প্রাণী সমূহের উপকারের জন্য ঋষিবৃন্দ নানাভাবে রোগ-প্রতীকারের কথাই আপন আপন সংহিতায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন,—ব্রহ্মসংহিতার পরবর্ত্তী কালের রচিত সংহিতাগুলির পরস্পরের মধ্যে ইহাই পার্থক্য মাত্র। কিন্তু সেই পার্থক্যের মধ্যে ইদানিন্তন কালে আমরা এমন ভেদাভেদের সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছি যে, তাহার ফলে আয়ুর্ব্বেদের মূল উৎপত্তিটুকু পর্য্যন্ত আমরা বিস্মৃত হইয়া পড়িতেছি।

বৈদিকযুগই আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির কাল। আয়ুর্ব্বেদের আবিষ্কারের পরে আয়ুর্ব্বেদ-অনুশীলনকারী দেবতা ও ঋষিবৃন্দ আয়ুর্ব্বেদের শিক্ষা ও পর্য্যালোচনা বিশেষভাবে করিলেও ধন্বন্তরি সম্প্রদায় এবং আত্রেয় সম্প্রদায় নামে আয়ুর্ব্বেদের অনুশীলনকারী মহর্ষিদিগের মধ্যে দুইটি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল। যাঁহারা সূর্য্যসংহিতার উপাসক হইয়া ভগবান ধন্বন্তরি প্রদর্শিত পন্থায় আয়ুর্ব্বেদের অনুশীলন করিয়া প্রাণী সমূহের কল্যাণ কামনা করিতে লাগিলেন, তাঁহারাই হইলেন ধন্বন্তরি সম্প্রদায় এবং যাঁহারা ইন্দ্রের নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত মহর্ষি ভরদ্বাজ প্রবর্ত্তিত মার্গে আয়ুর্ব্বেদের সেবা করিতে লাগিলেন তাঁহারা হইলেন আত্রেয় সম্প্রদায়। ধন্বন্তরি প্রবর্ত্তিত পন্থায় শল্য চিকিৎসা বিশ্বসংসারে এক অপূর্ব্ব আলোক সুধা বিতরণ করিয়া তুলিল। ধন্বন্তরির অবতার কাশীশ্বর দিবোদাসের প্রধান শিষ্য মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পুত্র মহর্ষি সুশ্রুত সেই অপূর্ব্ব আলোকসুধা বিতরণের শিখণ্ডী স্বরূপ। শল্য চিকিৎসার প্রকরণ-প্রণালী তিনি যেভাবে বিশ্ববাসীকে প্রদর্শন করিয়া দিয়াছেন, এখনও পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য দেশের শল্যবিদগণ শল্যবিদ্যায় সমগ্র বিশ্ববাসীকে বিমুগ্ধ করিয়া তুলিলেও সেই মহর্ষি সুশ্রুত প্রদর্শিত—সেই অতি তীব্র অথচ স্নিগ্ধমধুরোজ্জ্বল আলোকসুধা ছানিয়া লইয়া, তাহারই ফটোগ্রাফ বা ছায়া মূর্ত্তিরই অনুশীলন করিতেছেন। সুশ্রুত সংহিতার সহিত পাশ্চাত্যদেশের শল্যপ্রধান গ্রন্থগুলির অনেক বিষয়ে সামঞ্জস্য ইহারই

মুখ্য কারণ। তবে সুশ্রুত যুগের পর ভারত-বাসী এই বিদ্যা ছাড়িয়া দিলেন এবং পাশ্চাত্য দেশের চিকিৎসকগণ এই বিদ্যারই বিশেষভাবে আলোচনা করিতে লাগিলেন, সেই জন্য সুশ্রুত সংহিতা তাঁহাদিগের প্রথম পথপ্রদর্শক হইলেও উহার প্রতি সংস্কারে তাঁহারা আরও বহুল গবেষণা মূলক উন্নতি আমাদিগের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে পারিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

ব্রহ্মার ছিন্ন শিরঃ সংযোজনার ব্যবস্থা,—দক্ষের ছাগমুণ্ড সংযোজনায় তাঁহার নূতন জীবনের উপায় বিধান—এগুলি যে শল্য চিকিৎসারই চরম উন্নতির পরিচায়ক, তাহাতো আর বিশেষ করিয়া বলিতে হইবেনা। আত্রেয় প্রবর্ত্তিত শিক্ষা অপেক্ষা সুশ্রুত প্রবর্ত্তিত শিক্ষা কিছু আয়াসসাধ্য, এইজন্য আয়ুর্ব্বেদের প্রচার কর্ত্তা মহর্ষিগণের অনেকে আত্রেয় প্রবর্ত্তিত শিক্ষারই সমধিক অনুরাগী হইয়া পড়িয়াছিলেন, কালে আমরাও এখনকার দিনে সেই আত্রেয় প্রবর্ত্তিত সহজ সুলভ শিক্ষা লাভেই অধিক আশক্ত হইয়া পড়িয়াছি। আয়ুর্ব্বেদের শেষ উপাসক ঋষিকল্প গঙ্গাধর পর্য্যন্ত চরকের মত সুশ্রুতের উপাসনা তেমন করিয়া করিতে চেষ্টা করেন নাই, নতুবা তিনি যদি চরকের মত সুশ্রুত সংহিতারও উৎকৃষ্ট টীকা রচনায় মনোভিনিবেশ করিতেন এবং সেই সঙ্গে সুশ্রুত প্রদর্শিত পন্থানুসরণ করিয়া শল্যবিদ্যার বিস্তৃতি সাধনের জন্য প্রাণান্ত করিতে সঙ্কল্প করিতেন, তাহা হইলে আজ আয়ুর্ব্বেদীয় শিক্ষার পন্থা নির্দ্দেশের জন্য আমাদিগকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইতনা।

বাস্তবিকই গঙ্গাধর ঋষিকল্প চিকিৎসক ছিলেন। তিনি আয়ুর্ব্বেদের বিস্তৃতি কামনায় শিষ্য পরম্পরার মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য আজীবন আয়াস স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু পাশ্চাত্য শল্যবিদ্ চিকিৎসকগণকে তিনি ঘৃণা করিতেন। পাশ্চাত্যশল্যবিদ চিকিৎসকগণ মানবদেহের শল্যবিদ্ধ করে—ইহাই তাহাদিগের অপরাধ। কিন্তু দুঃখের বিষয় আয়ুর্ব্বেদের সকল শাস্ত্রে প্রগাঢ় জ্ঞান সম্পন্ন ওরূপ যোগ-সিদ্ধ চিকিৎসক পর্য্যন্ত আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির জন্য শল্য চিকিৎসার প্রচলনের উপকারিতা উপলব্ধি করিলেন না। আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার পন্থা নির্দ্দেশের জন্য আমাদের সন্দেহ দোদুল্য-মান মানসিক অবস্থার ইহাই কারণ।

কিন্তু একটা কথা,—মহাত্মা গঙ্গাধর শল্য চিকিৎসার প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন করিলেও কায়চিকিৎসার আলোচনায় তিনি যেরূপ সিদ্ধকাম হইয়া খ্যাতি প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন, এখনকার দিনে রোগবহুল জগতে শুধু সেই কায়চিকিৎসা দ্বারা সেরূপ খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভের আশা করা যাইতে পারে না—আর শুধু খ্যাতি-প্রতিপত্তির কথা নহে, মহাত্মা গঙ্গাধরের পর ভারতবর্ষে এখন এত নূতন রোগের সৃষ্টি হইয়াছে যে, শল্যকর্ম্মে পারদর্শী না হইলে তাহার সকলগুলির সহিত সংঘর্ষ করিয়া উঠাও শুধু কায়চিকিৎসায় কুলাইয়া উঠে না। বিশেষতঃ মহাত্মা গঙ্গাধর ঋষিকল্প চিকিৎসক ছিলেন, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এজন্য আয়ুর্ব্বেদের পরম যোগী মহাত্মা গঙ্গাধর বায়ুপিত্তকফের বিকৃতি-বৈষম্য—নাড়ী দেখিয়া যেরূপ নির্ণয় করিতে পারিতেন, ইদানিন্তন কালে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক সমাজে সেরূপ আশা কয়জনের

নিকট করা যাইতে পারে ? তা' ছাড়া সেকালে প্রাচীন বৈদ্যদিগের ভিতর যে সকল প্রত্যক্ষ সিদ্ধ টোটকা মুষ্টিযোগ ছিল, সেগুলির দ্বারা মর্ম্ম ভিতরে প্রবিষ্ট শল্যোদ্ধারের সহজ ব্যবস্থা করা যাইত, ডাক্তারি অ্যাপিনডিক্সের মত রোগ হইলে যাহার প্রয়োগ অব্যর্থ্য সন্ধান বলিয়া জনসাধারণে চমৎকৃত হইত, এক কথায় সেকালে ভীতিপ্রদ যন্ত্রণার প্রশমনোপায় যে সকল টোটকা বা মুষ্টিযোগ দ্বারা সহজেই হইতে পারিত, এক্ষণে ঘরের ঔষধ বলিয়া বৈদ্যমাত্রেই লুকাইয়া রাখিয়া সে সকল চিকিৎসা আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা হইতে লুপ্ত করিয়াছেন। কাজেই ব্রণের ছেদন, রোপণ ও উৎসাদনের জন্য—শল্যবিদ্ধ আতুরকে নিরাময় করিয়া তুলিবার জন্য, মূঢ়গর্ভের উপায় বিধানের জন্য আমাদিগকে যে মহর্ষি সুশ্রুতের সর্ব্বপ্রকারে উপাসনা করিতে হইবে—ইহাতে আর কথাই নাই। তবে এই শিক্ষার ব্যবস্থাটি কি ভাবে হইবে—তাহাই হইতেছে বিবেচনার বিষয়। আমরা শুধু সুশ্রুত সংহিতাই অধ্যয়ন করিয়া শিক্ষা লাভ করিব, না সুশ্রুত সংহিতার বিশ্লেষণ করিয়া শিক্ষা করিবার জন্য পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ চিকিৎসকদিগের শরণ গ্রহণ করিব—ইহাই হইয়াছে এখন আমাদের মধ্যে ভাবিবার কথা।

মহর্ষিবৃন্দই কিন্তু ইহার মীমাংসা করিয়া দিয়া গিয়াছেন, নিম্নে উহা উদ্ধৃত করিতেছি। দ্বিবিধং খলুজ্ঞানং ভবতি আনুমানিকমৈন্দ্রিয়ঞ্চ। শাস্ত্রাধ্যয়নাদ গুরুপদেশাৎ। সদৃশ দর্শনাদেশ্চা পায়দনুমিত্যাবস্তু স্বারূপ্যোপলব্ধির্ণা মানুমানিকম। ঐন্দ্রিয়ং নাম তদ্ যৎ সাক্ষাদিন্দ্রিয় দর্শক ব্যাপারাদি বির্ভবতি। দেঅপ্যাতে ভিষগ ভিবর্জ্জনীয়ে জ্ঞানে ধর্ম্মার্থযশঃ প্রেপসুভিঃ। ন খলু সর্ব্বত্র, তত্ত্ব বোধার্থ মিন্দ্রিয় প্রয়োগঃ সর্ব্বেষাং সুকরোভবতি। ন চ কেবলেনানুমানিক জ্ঞানেন কশ্চিৎ কর্ম্মসু পাটবং লভেত। বিশেষ তন্তু দেহ বিজ্ঞানে শস্ত্রাদি কর্ম্মনিচ ঐন্দ্রিয় জ্ঞানাসৈকাভূত এব প্রয়োজনং তদৃতে ন কথমপি তত্তাব বোধা জায়তে।

অর্থাৎ—সামান্যতঃ জ্ঞান দুই প্রকার—যথা—আনুমানিক ও ঐন্দ্রিয়। শাস্ত্রাধ্যয়ন গুরূপদেশ ও সদৃশ বস্তুর দর্শনাদির উপায় অবলম্বন করিয়া অনুমান শক্তিদ্বারা বস্তুর স্বরূপ ভাবিয়া লওয়াকে আনুমানিক জ্ঞান বলে। আর পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চেকর্ম্মেন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রয়োগদ্বারা যে জ্ঞান আবির্ভূত হয়, তাহাকে ঐন্দ্রিয় জ্ঞান বলা যায়। ধর্ম্ম, অর্থ যশোভিলাষী চিকিৎসকদিগের ঐ দুই প্রকার জ্ঞানই অর্জ্জন করা কর্ত্তব্য। সুতরাং শুধু সুশ্রুতসংহিতা অধ্যয়ন করিলেই শারীর বিদ্যায় জ্ঞানার্জ্জন লাভ করা সম্ভবপর হইবেনা, এজন্য পাশ্চাত্যবিজ্ঞানে উন্নত চিকিৎসকদিগের নিকট ঐ সংহিতারই প্রতি সংস্কৃত শিক্ষায় হাতে-কলমে আমাদিগকে শিক্ষা লাভ করিতে হইবে।

লোকপিতামহ ব্রহ্মা চিকিৎসা বিদ্যার আবিষ্কর্ত্তা—সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এজন্য আত্রেয় প্রবর্ত্তিত সরণী অথবা সুশ্রুত প্রবর্ত্তিত মার্গ—যে পন্থাই আমরা অনুসরণ করিনা কেন, মূলে সেই ব্রহ্মপ্রোক্ত চিকিৎসার পন্থাই আমরা অনুসরণ করিব তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে এই রোগবাহুল্যের যুগে সুশ্রুত সংহিতাকে আদর্শ না করিলে

আমরা যে কখন পুনরুত্থিত হইতে পারিব না —ইহাও অবিসংবাদিত সত্য। কলিকাতার অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ে এই সত্যতা অক্ষুণ্ণ রাখিবারই ব্যবস্থা প্রকটিত। আমাদের মনে হয় অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের এই প্রচলিত ব্যবস্থার পন্থানুসরনই আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার্থি দিগের মধ্যে সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য এবং যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাকে আবার জনসাধারণের মধ্যে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার আয়োজন করিতেছেন, তাঁহারা তাঁহাদের শিক্ষা ব্যাপারে মহর্ষি আত্রেয় প্রদর্শিত শিক্ষা বিস্তার করিলেও মহর্ষি সুশ্রুতের সর্ব্বপ্রকার চিকিৎসার শিক্ষাদান করিয়া এবং ঐ শিক্ষার সাফল্য সাধনের জন্য পাশ্চাত্য চিকিৎসকদিগের নিকট আপাততঃ বিশদ উপদেশলাভের ব্যবস্থা করিয়া লুপ্তপ্রায় আয়ুর্ব্বেদকে আবার জাগাইয়া তুলিতে চেষ্টা করুন। আত্রেয় প্রবর্ত্তিত শিক্ষাভিমানী চিকিৎসক তাহা পরিয়া উঠিবেন কি? পারিলে কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ যে আবার মাথা তুলিয়া উঠিবে তাহা নিশ্চিত।

পানীয় জল।

[কবিরাজ—শ্রীগোষ্ঠবিহারী গোস্বামী ভিষগাচার্য্য]

মানবগণের স্বাস্থ্যসংরক্ষণের প্রধান সামগ্রী পানীয় জল। জল দ্বারাই জীবগণ প্রাণধারণ করিয়া থাকে। প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ জলকে অমৃত নামে অভিহিত করিয়াছেন। বাস্তবিক জলের অমৃত পর্য্যায়টী যথার্থ সঙ্গত হইয়াছে, কারণ যে দ্রব্য ব্যতীত জীবগণ ক্ষণকাল জীবনধারণে সক্ষম হয় না—তাহার নাম অমৃত ভিন্ন আর কি হইতে পারে? বস্তুতঃ দেহের পক্ষে সেই অমৃতরূপী জল পান সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। কিন্তু ঐ জলই যথানিয়মে ব্যবহার না করিলে কিম্বা দূষিত জল ব্যবহার করিলে জীবন রক্ষা দূরে থাকুক বরং জীবননাশের আশঙ্কা জন্মিয়া থাকে, অতএব সাধারণের অবগতির নিমিত্ত, পানীয় জল কি প্রকার গুণবিশিষ্ট এবং কি প্রকারেই বা তাহা ব্যবহার করিলে সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে পারা যায়, তদ্বিষয়ে নিখিল জ্ঞানশালী প্রাচীন ঋষিগণ যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহাই অবলম্বনে বিস্তারিত ভাবে এই প্রবন্ধ লিখিত হইতেছে।

পানীয়ং মুনিভিঃ প্রোক্তং দিব্যং ভৌমমিতি দ্বিধা।
দিব্যং চতুর্ব্বিধং প্রোক্তং ধারজং করকাভবং॥
তৌষারঞ্চ তথা হৈমং তেষু ধারং গুণাধিকম্॥

পানীয় জল দুই প্রকার দিব্য অর্থাৎ শূন্য হইতে পতিত ও ভৌম অর্থাৎ প্রস্রবনাদি হইতে উৎপন্ন। তাহার মধ্যে দিব্য পানীয় চারি

প্রকার,—ধারাপতিত, করকোৎপন্ন, শিশিরজ ও হিমসম্ভব।

ধারজলের লক্ষণ ও গুণ।—আন্তরিক্ষ হইতে যে জলধারা বিশিষ্ট হইয়া পতিত হয়, তাহাকেই ধার (বৃষ্টি) জল বলা যায়।

উক্ত ধার জল দুই প্রকার—যথা—সামুদ্র ও গাঙ্গ।

বর্ষাকালে আকাশসঞ্চারি সর্পাদি সবিষ প্রাণীর ফুৎকার ও বিষবায়ু সংস্পর্শে দূষিত হইয়া বিষযুক্ত যে জল বর্ষিত হয় তাহারই নাম সামুদ্রজল। এই সামুদ্র জল স্নান পানাদিতে কখনই ব্যবহার করিবে না। কারণ এই জল শরীরের শুক্র, বল ও দৃষ্টিশক্তি বিনষ্ট করে এবং বায়ু, পিত্ত ও কফের প্রকোপ জন্মায়, ইহা ক্ষার ও লবণ রস এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধ।

গাঙ্গ নামক নির্দ্দোষ ধার জল, বায়ু, পিত্ত ও কফবিনাশক, অস্পষ্ট রস, লঘু, শীতল, বল ও পুষ্টিকারক, চিত্তের আহ্লাদ ও তৃপ্তি সম্পাদক, পাচক ও বুদ্ধিকারক, মূর্চ্ছা, তন্দ্রা, দাহ, তৃষ্ণা, শ্রম ও ক্লান্তি নিবারক। এই জল সর্ব্বদা স্নান ও পানাদিতে ব্যবহার করা যায়।

আকালিক—(পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে বর্ষিত) ধার জল কখনও স্নান পানাদিতে ব্যবহার করিবে না। কারণ ইহা বায়ু, পিত্ত ও কফবর্দ্ধক।

সামুদ্র ও গাঙ্গজলের বিশেষ পরীক্ষা।—হৈমন্তিক আমন ধান্তের অন্ন, রূপার পাত্র মধ্যে সংস্থাপিত করিয়া দুই দণ্ডকাল বাহিরে বৃষ্টিতে রাখিবে। যদি ঐ অন্ন বৃষ্টি জলে সিক্ত হইয়া বিবর্ণ, কণা বা ক্লেদযুক্ত হয়, তবে ঐ বৃষ্টির জলকে সামুদ্র (সদোষ) বলিয়া জানিবে।

ধারজল গ্রহণের নিয়ম।—বৃষ্টির সময় পরিষ্কার বস্ত্র দ্বারা গৃহীত কিম্বা নির্ম্মল প্রস্তর পাত্রে পতিত জল গ্রহণ করিবে। তৎপরে ঐ জল স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, মৃণ্ময় কিম্বা কাচ-নির্ম্মিত ভাণ্ডে স্থাপিত করিয়া রাখিবে।

যে দিবস বৃষ্টির জল গ্রহণ করা যায়, সেই দিবস ঐ জল কখনই ব্যবহার করিবে না। কারণ তাহাতে শারীরিক অসুস্থতা উৎপন্ন হয়। অতএব ঐ জল পূর্ব্বোক্ত ভাণ্ডে তিন দিবস রাখিয়া দিবে পরে পরিষ্কৃত উক্ত জল ব্যবহার করিলে উহা অমৃত তুল্য হয়।

কারক জলের লক্ষণ ও গুণ।—শূন্যমার্গে বায়ু ও বিদ্যুত দ্বারা ঘর্ষণ প্রাপ্ত হইয়া প্রস্তর সদৃশ কঠিন খণ্ড খণ্ড যে দ্রব্য ভূমণ্ডলে পতিত হয় তাহার নাম কারকা, এই কারকা যখন কঠিন অবস্থায় থাকে তখন উহা অমৃতগুণ বিশিষ্ট হইয়া থাকে। কারকাজ পানীয় জল রুক্ষ, নির্ম্মল, গুরুপাক, অত্যন্ত শীতল ও ঘন, উহা সেবনে শরীরস্থ দূষিত পিত্তের প্রশমন হয় কিন্তু কফও বায়ুর প্রবলতা জন্মাইয়া থাকে।

তৌষার জলের লক্ষণ ও গুণ। শিশির জলকে তৌষার বলা যায়। অথবা সামুদ্র ও নদীতে যে এক প্রকার অগ্নি (তেজঃ) বর্ত্তমান আছে, সেই অগ্নির উত্তাপে সমুত্থিত ধূমাংস রহিত যে জলীয় অংশ (বাষ্প) তাহাকেই তৌষার বা শিশির বলা যায়। তুষার হইতে উৎপন্ন পানীয় জলও রুক্ষগুণ বিশিষ্ট হইয়া থাকে। উহা সেবনে কফ ও পিত্ত নষ্ট হয় বটে কিন্তু শরীরে বায়ুর শক্তি বৃদ্ধি করিয়া থাকে। তুষার জল সেবনে উরুস্তম্ভ, গলরোগ, অগ্নিমান্দ্য ও মেদরোগ নষ্ট হইয়া থাকে।

হৈম জলের লক্ষণ ও গুণ।—হিমালয়

প্রভৃতি উচ্চ গিরিশৃঙ্গে স্তূপাকার বহু কঠিন হিমরাশি জন্মাইয়া থাকে, সময়ে সময়ে ঐ কঠিন হিমরাশি দ্রবীভূত হইয়া জল উৎপন্ন হয়, পণ্ডিতগণ ঐ জলকে হৈমজল বলিয়া থাকেন। হৈমজল শীতল, উহা সেবনে দেহস্থিত কুপিত পিত্ত নষ্ট হইয়া যায় বটে, কিন্তু বায়ুর আধিক্য জন্মাইয়া থাকে। হিম স্বভাবতঃ শীতল, রুক্ষ ও স্থূল পরমাণু রহিত, উহাতে শরীরস্থ বায়ু, পিত্ত কিম্বা কফের আধিক্য হয় না।

এই চতুর্ব্বিধ দিব্য জল মধ্যে লঘুত্ব হেতু-গাঙ্গ নামক ধার জলই শ্রেষ্ঠ ও হিতকারক।

গাঙ্গ নামক ধার জলের অভাবে ভৌমজল স্নান পানাদিতে ব্যবহার করিবে।

ভৌমমম্ভো নিগাদতং প্রথমং ত্রিবিধং বুধৈঃ।
জাঙ্গলং পরমানুপংততঃ সাধারণং ক্রমাৎ॥

ভৌম জলকে দেশ ভেদে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা জাঙ্গল, আনূপ ও সাধারণ।

জাঙ্গল জলের লক্ষণ ও গুণ।—যে দেশে অল্প জল ও অল্প বৃক্ষ থাকে, এবং পিত্ত ও রক্ত জন্য রোগের অধিক প্রাদুর্ভাব দেখা যায়, সেই দেশকে জাঙ্গল বলে, তদ্দেশস্থ জলকেই জাঙ্গল জল বলা যায়। এই জল—লঘু, রুক্ষ, লবণ রস, পিত্তনাশক এবং কফ ও অগ্নিবর্দ্ধক।

আনূপ জলের লক্ষণ ও গুণ।—যে দেশে বহু জল ও বহু বৃক্ষ থাকে এবং বায়ু ও কফ জন্য রোগের আধিক্য দেখা যায়, সেই দেশকে আনূপ বলে, এবং তদ্দেশস্থ জলকেই আনূপ জল বলা যায়। এই জল গুরু, স্নিগ্ধ, ঘন, অভিষ্যন্দী, মধুর রস, অগ্নি ও কফবর্দ্ধক এবং তৃপ্তিকারক।

সাধারণ জলের লক্ষণ ও গুণ।—পূর্ব্বে যে জাঙ্গল ও আনূপ দেশের লক্ষণ বলা হইল, উক্ত উভয় দেশের মিশ্রিত লক্ষণযুক্ত দেশকে সাধারণ বলা যায়; এবং তদ্দেশস্থ জলকেই সাধারণ জল বলে। এই জল মধুর রস, অগ্নির দীপ্তি-কারক, শীতল, লঘু, তৃপ্তি ও রুচিকারক, তৃষ্ণা দাহ, বায়ু, পিত্ত ও কফ দোষ নিবারক।

ভৌম জলকে সাধারণতঃ দ্বাদশভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা—নাদেয়, ঔদ্ভিদ, নৈর্ঝর, সারস, তাড়াগ, বাপ্য, কৌপ, চৌণ্ড্য, পাল্বল, বৈরিক, কৈদার এবং সামুদ্র।

নাদেয় জলের লক্ষণ ও গুণ।—নদ বা নদীর জলকে নাদেয় বলা যায়। এই জল, রুক্ষ, লঘু, বিশদ, অনভিষ্যন্দী, কটুরস, বায়ুবর্দ্ধক ও অগ্নিকারক এবং কফ ও পিত্তনাশক।

অধিক স্রোতঃবিশিষ্ট নদীর জল যদি নির্ম্মল হয়—তবে তাহা লঘু। আর মন্দগামিনী ও শৈবালযুক্তা এবং আবিলা হইলে গুরু হইয়া থাকে।

হিমালয় পর্ব্বত হইতে সমুদ্ভূত গঙ্গা, শতদ্রু, সরযূ ও যমুনা প্রভৃতি নদীর জল স্বভাবতঃ অধিক গুণবিশিষ্ট ও হিতকারক। যে নদীর জল সর্ব্বদা প্রস্তর দ্বারা আস্ফালিত হয়, তাহাও উক্ত প্রকার গুণশালী।

সহ্য পর্ব্বত হইতে সমুৎপন্ন বেণ ও গোদাবরী প্রভৃতি নদীর জল স্বভাবতঃ দূষিত, ঐ জল ব্যবহার করিলে কুষ্ঠ এবং বায়ু ও কফ জন্য রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা।

ঔদ্ভিদ জলের লক্ষণ ও গুণ।—নিম্নভূমি বিদীর্ণ করিয়া বৃহৎ ধারাতে যে জল স্বয়ং উদ্গত হয়, তাহাকেই ঔদ্ভিদ জল বলা যায়। এই জল অতি শীতল, অবিদাহী, পিত্তনাশক,

মধুর রস, প্রীতি ও বলকারক, লঘু এবং অল্প বায়ুবর্দ্ধক।

নৈর্ঝর জলের লক্ষণ ও গুণ।—পর্ব্বতকন্দর হইতে প্রবাহিত জলকে নৈর্ঝর জল বলা যায়। এই জল লঘু, মধুর, রসপাকে কটুরস, রুচি ও অগ্নিকারক, কফনাশক এবং বায়ু ও পিত্ত বর্দ্ধক।

সারস জলের লক্ষণ ও গুণ।—পর্ব্বতাদি দ্বারা সংরুদ্ধ নদীর জল বেগ প্রতিঘাত হেতু অন্যত্র গমন করতঃ যে স্থানে আবদ্ধ থাকে এবং যাহাতে অধিক পরিমাণে পদ্ম পুষ্পাদি জন্মে তাহাকে সারস বলে, তত্রস্থ জলকে সারস নামে অভিহিত করা যায়। এই জল লঘু, রুক্ষ, মধুর রস, তৃষ্ণানিবারক, বল ও রুচিকারক এবং মল মূত্রের বদ্ধতা জনক।

তাড়াগ জলের লক্ষণ ও গুণ।—বিস্তৃত ভূমিখণ্ডে বহুকালস্থিত জলাশয়কে তড়াগ বলা যায়। অত্রস্থ জলই তড়াগ নামে অভিহিত হয়। এই জল স্বাদু ও কষায় রস, পরিপাকে কটু, রস বায়ুবর্দ্ধক, মল মূত্রের বদ্ধতাজনক রক্তপিত্ত ও কফ জন্য রোগ বিনাশক।

বাপ্য জলের লক্ষণ ও গুণ।—প্রস্তর অথবা ইষ্টকাদি দ্বারা চতুর্দ্দিকে বদ্ধ ও সোপান যুক্ত, অতি বৃহৎ কূপকে বাপী অর্থাৎ পুষ্করিণী বলা যায়। তত্রস্থ জলই বাপ্য নামে কথিত হয়। এই জল ক্ষার রস হইলে পিত্তবর্দ্ধক ও কফ বায়ুর শান্তিকারক হয়। আর মধুর রস হইলে কফবর্দ্ধক ও বায়ুপিত্ত নাশক হয়।

কৌপ জলের লক্ষণ ও গুণ।—অতি অল্প বিস্তৃত, গভীর ও গোলাকৃতি ইষ্টকাদি দ্বারা বদ্ধ বা আবদ্ধ, থাতকে কূপ বলা যায়, তত্রস্থ জলই কৌপ নামে অভিহিত। এই জল মধুর রস হইলে লঘু, সুপথ্য ও ত্রিদোষ (বায়ু পিত্ত কফ) নাশক হয়। আর ক্ষার রস হইসে অগ্নি ও পিত্তবর্দ্ধক এবং বায়ু ও কফ নাশক হয়।

চৌণ্ডজলের লক্ষণ ও গুণ।—লতাসমূহ দ্বারা সমাচ্ছন্ন ও প্রস্তর সমাকীর্ণ, নীলাঞ্জন সদৃশ জল বিশিষ্ট স্বয়ং সমুৎপন্ন গহ্বরকে চুণ্ড বলা যায়। তত্রস্থ জলই চৌণ্ড নামে কথিত হয়। এই জল লঘু, রুক্ষ, বিশদ, পাচক, মধুর রস, কফ ও পিত্ত নাশক, রুচি ও অগ্নিকারক।

পাল্বল জলের লক্ষণ ও গুণ।—অতি ক্ষুদ্র জলাশয়কে পল্বল (ক্ষুদ্র বিল) বলা যায়। ইহাতে অগ্রহায়ণ মাসে প্রায়ই জল থাকে না। এইরূপ ক্ষুদ্র জলাশয়স্থ জলই পাল্বল নামে কথিত হয়। এই জল গুরু, অভিষ্যন্দী, মধুর রস এবং ত্রিদোষ বর্দ্ধক।

বৈকির জলের লক্ষণ ও গুণ।—নদীর নিকটস্থ বালুকাময় ভুমি হইতে বালুকা বিকী-রণ করিলে যে জল উত্থিত হয়, তাহার নাম বৈকির। এই জল শীতল, স্বচ্ছ, লঘু ও নির্দ্দোষ।

কৈদার জলের লক্ষণ ও গুণ।—ক্ষেত্রস্থিত জলকে কেদার বলা যায়, এই জল মধুর রস, গুরু, অভিষ্যন্দী ও বাতাদি দোষ বর্দ্ধক।

সামুদ্রজলের গুণ।—সামুদ্রজল লবণ রস, দুর্গন্ধি ও ত্রিদোষ (বায়ু পিত্ত কফ) প্রকোপ কারক।

স্নান ও পানাদিতে ব্যবহারের নিমিত্ত ভৌমজল প্রাতঃকালেই গ্রহণ করা সমুচিত, কারণ প্রাতঃসময়ে ঐ জল নির্ম্মল ও শীতল

থাকে। তৎপরে ক্রমশঃ উহা উষ্ণ ও আবিল হইতে থাকে।

অবিকৃত ও প্রশস্ত জলের লক্ষণ। নির্গন্ধ অস্পষ্ট রস, তৃষ্ণানিবারক, পরিষ্কৃত, শীতল, স্বচ্ছ, লঘু ও চিত্তের প্রীতি সম্পাদক। যে জল দিবসে সূর্য্য কিরণে এবং রাত্রিতে চন্দ্রকিরণে সংপৃক্ত হয় এবং যাহা অরুক্ষ ও অনভিষ্যন্দী তাহাই প্রশস্ত।

জল দুষ্টির কারণ ও লক্ষণ।—কীট, মূত্র বিষ্ঠা, অণ্ড, শব (মৃতদেহ) দুর্গন্ধ দ্রব্য ও পচা দ্রব্য দ্বারা দূষিত, তৃণ পত্রাদি সংযুক্ত, আবিল (ঘোলা) ও বিষ সংযুক্ত জল এবং বর্ষাকালের নূতন জল, স্নান ও পানাদিতে কখনও ব্যবহার করিবে না। কারণ উক্ত জল ব্যবহার করিলে বাহ্য ও আভ্যন্তরিক নানাবিধ রোগ উৎপন্ন হইতে পারে এবং পানা, শেওলা, কর্দ্দম, তৃণ,পদ্মপত্র প্রভৃতি দ্বারা সমাচ্ছন্ন, চন্দ্র ও সূর্য্যকিরণ রহিত বায়ুদ্বারা অসংপৃষ্ট, স্পষ্টগন্ধবর্ণ ও রস সংযুক্তজলও দূষিত, সুতরাং অপেয়।

এতদ্ভিন্ন জলের আরও ছয় প্রকার দোষ আছে, যথা - স্পর্শদোষ, রূপদোষ, রসদোষ, গন্ধদোষ, বীর্য্যদোষ ও বিপাক দোষ।

জলের খরতা, পিচ্ছিলতা, উষ্ণতা ও দন্ত গ্রাহিতা (দাঁতধরা) স্পর্শদোষ।

কর্দ্দম, বালুকা ও শৈবালবর্ণতা এবং বহু-বর্ণনা রূপদোষ।

কোন প্রকার রসাস্পষ্ট অনভূত হওয়া রস দোষ। জলের দুর্গন্ধিভাব গন্ধদোষ। যে জল স্নানে ও পানে ব্যবহার করিলে, পিপাসা, শরীরের গুরুত্ব, শূল ও কফস্রাব জন্মে, সেই জলকে বিপাক দোষে দূষিত বলিয়া জানিবে।

যে জল পীত হইলে অধিককালে জীর্ণ হয় অথবা উদরের বিষ্টব্ধতা (স্ফীততা) জন্মে, সেই জলকে বিপাক দোষে দূষিত বলিয়া জানিবে।

এই সমস্ত দোষ কেবল ভৌম জলেই লক্ষিত হয়, দিব্য জলে (বৃষ্টিজলে) এই সমস্ত দোষের সম্ভাবনা নাই।

দূষিত জল সংশোধন না করিয়া স্নান ও পানাদিতে ব্যবহার করিলে, শোথ, পাণ্ডুরোগ, চর্ম্মরোগ, অপাক, শ্বাস, কাস, সর্দ্দি, শূল, গুল্ম, উদররোগ, এবং অন্যান্য নানাবিধ কঠিন রোগ শীঘ্র উৎপন্ন হয়।

জল শোধন বিধি।—দূষিত জলকে অগ্নি অথবা সূর্য্যের উত্তাপে উত্তপ্ত করিবে। অথবা লৌহ পিণ্ড, স্বর্ণ, রৌপ্য, প্রস্তর, বালুকা কিম্বা মৃৎপিণ্ড অত্যন্ত অগ্নিসন্তপ্ত করিয়া সাতবার নিক্ষেপ করিলেই জল পরিশুদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা যদি দেখা যায় যে, সাত বারেও জল শোধিত হয় নাই, তবে আরও যতবার ঐরূপ নিক্ষেপ করিলে সম্যকরূপে পরিশুদ্ধ হয়—ততবারই নিক্ষেপ করিবে।

তদনন্তর (নির্ম্মলীফল), গোমেদ (মণিবিশেষ) মুক্তা, মৃণাল শৈবাল, পর্ণমূল—ইহার কোনও একটী অথবা সমস্ত ঐ জলে নিঃক্ষেপ করিয়া কিছুকাল রাখিয়া দিবে। ইহাতে জলের প্রসাদন (পরিষ্কৃতি) সম্পাদিত হয়, তৎপরে স্থূল বস্ত্র দ্বারা ঐ জল পাত্রান্তরে রাখিয়া নাগকেশর, চম্পক, উৎপল ও পাটল প্রভৃতি সুগন্ধি পুষ্প ও কর্পূরাদি দ্বারা সুবাসিত করিয়া স্নান পানাদিতে ব্যবহার করিবে।

জলপান ব্যবস্থা।—আহার কালে অধিক জলপান করিলে আহার সম্যকরূপে পরিপাক

পায় না, একেবারে জলপান না করিলেও ঐ দোষ ঘটে, অতএব অগ্নি বর্দ্ধনের নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ অল্প পরিমাণে জল পান করা কর্ত্তব্য।

তৃষ্ণা গরীয়সী ঘোরা সদ্যপ্রাণ বিনাশিনী।
তস্মাদ্দেয়ং তৃষ্ণার্ত্তায় পানীয়ং প্রাণধারণম্॥
তৃষিতো মোহমায়াতি মোহাৎ প্রাণান্
বিমুঞ্চতি।
অতঃ সর্ব্বাস্ববস্থাসু ন ক্বচিৎ বারি বার্য্যতে॥

গরীয়সী তৃষ্ণা অতি ভয়ানক, তাহা সদ্যঃ প্রাণ বিনাশ করিতে পারে; অতএব তৃষিত ব্যক্তিকে প্রাণধারণোপযোগী পানীয় প্রদান করিবে। তৃষিত ব্যক্তি জলপান করিতে না পাইলে মোহ প্রাপ্ত হয়, পরিশেষে ঐ মোহই চিরমোহ হইয়া পড়ে, এই মারাত্মক অনিষ্টের আশঙ্কা করিয়া আয়ুর্ব্বেদ কোন অবস্থাতেই জল বন্ধ করার উপদেশ করেন নাই।

ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্ত, মূর্চ্ছা, মদাত্যয়, দাহ, ভ্রম, ক্লম, তমকশ্বাস, বমি, রক্ত ও পিত্তজন্য রোগ ও বিষরোগ এবং উষ্ণতাযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে শীতল জল পান প্রশস্ত।

কিন্তু পার্শ্বশূল, প্রতিশ্যায় (সর্দ্দি) বাত রোগ, গলগ্রহ, আধ্মান, স্তব্ধকোষ্ঠ, নবজ্বর ও হিক্কা রোগযুক্ত ও বমিত, বিরিক্ত, এবং পীতস্নেহ ব্যক্তির পক্ষে শীতল জল পান নিষিদ্ধ।

অরুচি, সর্দ্দি, কফস্রাব, শোথ, ক্ষয়, মন্দাগ্নি, কুষ্ঠ, জ্বর, নেত্ররোগ, ব্রণ, মধুমেহ ও উদররোগযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে অতি অল্প জল পান বিহিত।

মদ্যপান জন্য রোগে, পিত্তজ রোগে ও সান্নিপাতিক রোগে শৃত শীতল জল (উষ্ণজল শীতল করিয়া) পান করা বিধেয়।

উষ্ণ জলের লক্ষণ।—কোন পাত্র মধ্যে জল রাখিয়া সিদ্ধ করিতে করিতে যখন নির্ব্বেগ, নিষ্ফেন ও নির্ম্মল এবং অর্দ্ধাবশিষ্ট হইবে, তখন সেই সিদ্ধ জলকে উষ্ণ জল বলিয়া অভিহিত করা যাইবে। দিবসে সিদ্ধকরা জল রাত্রিকালে, রাত্রিকালের সিদ্ধ করা জল দিবসে কদাপি ব্যবহার করিবে না। ঐ জল অতিশয় দূষিত।

উষ্ণ জলের গুণ।—উষ্ণজল কফ, মেদ, বায়ু ও আমদোষ নিবারক, অগ্নিকারক, বস্তি শোধক, শ্বাস কাস ও জ্বর রোগ বিনাশক।

অন্তর্ব্বাষ্পে সিদ্ধ ও স্বয়ং শীতলীভূত জল ত্রিদোষঘ্ন, কিন্তু উক্ত সিদ্ধ জল বায়ু দ্বারা শীতল করিয়া ব্যবহার করিলে উদরাধ্মান ও অজীর্ণ কারক হইয়া থাকে।

শীতল জল পান করিলে দুই প্রহরে উহা জীর্ণ হয়। শৃত শীতল জল এক প্রহরে জীর্ণ হয় এবং ঈষদুষ্ণ জল পান করিলে অর্দ্ধ প্রহরে উহা জীর্ণ হইয়া থাকে।

বাঙ্গালীর বাঁচিবার উপায়।*

[শ্রীইন্দুভূষণ সেনগুপ্ত এইচ, এম্‌-বি]

দিন দিন বঙ্গের সকল স্থলেই যেরূপ লোক-ক্ষয় হইতে বসিয়াছে, তাহাতে মনে হয়—সোণার বাঙ্গালা বুঝি কিছুকাল পরে শ্মশানে পরিণত হইবে। পল্লীগুলির ত কথাই নাই, সহরগুলিতেও লোকক্ষয় যথেষ্ট। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে বঙ্গের যে সকল পল্লী জনবহুল ছিল, এখন আর সেখানে এক তৃতীয়াংশ লোকও নাই। এই লোকক্ষয়ের কারণ অনেক। ইহার মধ্যে রুচি পরিবর্ত্তনে বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য-হানির কারণ জন্মাইয়া বাঙ্গালীকে অল্পায়ু করায় বাঙ্গালার লোক সংখ্যা যে কমিয়া যাইতেছে—ইহাও অস্বীকার করিবার যো নাই। সত্য কথা বলিতে কি, এখন ৩০ এর কোটা পার না হইতেই অনেককে পৃথিবীর মায়া পরিত্যাগ করিয়া পরলোকের যাত্রী হইতে হয়। বাঙ্গালার পল্লীগুলিতে লোকসংখ্যা ক্রমে কিরূপ হ্রাস পাইতে বসিয়াছে—তাহা পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে প্রদান করিলাম। দেখিবেন জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুর হারই অধিক।

বাঙ্গালায় জন্ম মৃত্যুর হাজার করা হার।

জেলার নাম	জন্ম	মৃত্যু	মৃত্যুর আধিক্য
বর্দ্ধমান	২১-২	৫০-৫	২৯-৩
বাঁকুড়া	১৫	৪৫-৫	১৯-৫
মেদিনীপুর	২৪-২	৪০-১	২৫-৯
হুগলী	২১-৫	৩৬-১	১৪-১
হাওড়া	২৭	৩৫-১	৮১
২৪ পরগণা	২২-৫	৩-৪	১০-৯
নদীয়া	২৪-৬	৪৩	১৭-৪
মুরশিদাবাদ	২৮-৯	৪৭-৩	১৮-৪
যশোহর	২১	৩০-২	৯-২
খুলনা	২৭ ৮	৪০-২	১৩-৪
রাজসাহি	৩২-৮	৪১-৫	৮-৭
দিনাজপুর	৩১-৬	৪৩-৭	১২-১
জলপাইগুড়ি	৩২-৪	৪৮-৪	১০-২
দার্জ্জিলিং	৩০	৪৮-৪	১৮ ৪
রংপুর	৩২-৪	৩৩-৪	১
পাবনা	২৫-৭	৩৬	১০-৪
মালদহ	৩০-৫	৩৯	৮৫
ময়মনসিংহ	২৭-৩	২৭-৭	৮৪
বাখরগঞ্জ	২৯-৮	৩৪-৭	৪৯
চট্টগ্রাম	৩০-৩	৪১-৪	১০-১
নোয়াখালি	৩২-৮	৩৩-৪	১০-৬
ত্রিপুরা	২৭-৮	২৯-৪	১৬

এই তো গেল বাঙ্গালার জেলাগুলির জন্ম-মৃত্যুর হার। এখন ১৮৭০ অব্দ হইতে ১৯১১ অব্দ পর্য্যন্ত ভারতের লোক সংখ্যার তালিকা দেখুন —

সন	লোক সংখ্যা
১৮৭০	১৮, ৫৫, ৩৭, ৮৯৮ জন
১৮৮১	১৯, ৮৭, ৯০, ৮৫৩ ,,
১৮৯১	২২, ১১, ৭২, ৯৫২ ,,
১৯০১	২৩, ১০, ৮৫, ১৩১ ,,
১৯১১	৩১, ৫০, ০০, ০০০ ,,

* শান্তিপুর—"সাহিত্য পরিষদ ভবনে" "সাহিত্য সম্মিলনীর" ৪র্থ বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে ভারতের লোক বৃদ্ধি—

১৯০১—১৯১১	শতকরা ১৩ জন
১৮৯১—১৯০২	,, ২ ,,
১৮৮১—১৮৯১	,, ২১ ,,

বৃদ্ধি হইয়াছে।

মৃত্যুর তালিকা কিরূপ দেখুন—

সন	হাজার করা	মৃত্যু সংখ্যা
১৮৮০	,,	২৩ জন
১৮৮৫	,,	২৬ ,,
১৮৮৯	,,	২৮ ,,
১৮৯৪	,,	৩৫ ,,
১৮৯৭	,,	৩৬ ,,
১৯০০	,,	৩৯ ,,

ফল কথা অন্যান্য দেশের—তুলনায়—ভারতবর্ষের বৃদ্ধির হার অনেক কম।

১৯০১—১৯১১ সালের মধ্যে ইংলণ্ডে ও ওয়েলসে শতকরা ১০৯ জন তন্মধ্যে কেবল ওয়েলসেই শতকরা ১৮'১ জন, স্কটল্যাণ্ডে শতকরা ৬'৪ জন বৃদ্ধি হইয়াছে। আয়রলণ্ডে ১৮৫১—১৮৬১ এই দশ বৎসরে শতকরা ১১'৮ হারে লোক বৃদ্ধি হইয়াছে। ক্যানেডার লোকসংখ্যা ১৯০১ - ১৯১১ পর্য্যন্ত শতকরা ৩৪ হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে অন্যান্য দেশের তুলনায় এ দেশের লোকবৃদ্ধির হার কম ও এ দেশের জনসাধারণের মধ্যে জন্মের হার অপেক্ষা মৃত্যুর হার দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

এখন দেখা যাউক কোন্ জাতি অধিক মরিয়া থাকে। বঙ্গের হিন্দুর মৃত্যু সংখ্যা হাজার করা ৩৭, মুসলমানের ৩৫ ও খৃষ্টানের ২৫। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে হিন্দু-জাতিই অন্যজাতি অপেক্ষা বেশী মরিয়া থাকে।

এখন আমাদের দেখা উচিত হিন্দু কেন অন্যজাতি অপেক্ষা বেশী মরে ইহার আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই—আধুনিক শিক্ষা ও আচার ব্যবহার, রীতিনীতি, পানভোজন, পোষাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতির পরিবর্ত্তনই ইহার অন্যতম কারণ। মুসলমান-গণ তাঁহাদের আচার-ব্যবহার প্রভৃতি অনেকাংশে বজায় রাখিতে পারিয়াছেন। কিন্তু অনুকরণপ্রিয় হিন্দুগণ স্বধর্ম্মচ্যুতির ফলে রোগরাক্ষসদিগের নানা মূর্ত্তিকে সহজেই আলিঙ্গন করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছেন।

পূর্ব্বে হিন্দুদিগের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্য বলিয়া একটা জিনিষ ছিল। কিন্তু এখন তাহাও লোপ পাইতে বসিয়াছে। প্রত্যুষে উঠিয়া বাটীর নিকটস্থ পুষ্করিণী বা নদী হইতে প্রাতঃস্নান প্রভৃতি প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন সেকালে হিন্দুমাত্রেরই করণীয় ছিল। এখন তাহা লোপ পাইয়াছে। এই প্রাতঃস্নানের পর পূজা আহ্নিকে মনোভিবেনিশের ব্যবস্থা ছিল। এখনকার দিনে তাহার প্রথা আর নাই। এই পূজা অর্চ্চনার জন্য পুষ্পবাটিকায় পুষ্প তুলিবার ব্যবস্থা ছিল। পুষ্পের সদগন্ধ উপভোগে স্বাস্থ্যোন্নতির উপায়বিধানের সহিত প্রাতঃভ্রমণের ব্যবস্থায় শারীরিক পুষ্টিলাভ হইত। এখন সভ্যতা-গর্ব্বে মুগ্ধ বাঙ্গালী সে সকল পদ্ধতি ছাড়িয়া দিয়াছে।

পূর্ব্বে সকলের গৃহে গাভী পালন ধর্ম্মকার্য্যের মধ্যে পরিগণিত হইত। তাহার ফলে বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে দুগ্ধ হইত।

বাঙ্গালী সেই দুগ্ধ বা অমৃতের আস্বাদনে তৃপ্তিলাভপূর্ব্বক স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় বিধান করিত। এখন সে সকল ব্যবস্থা উঠিয়া গিয়াছে, বাঙ্গালী মরিবে না কেন?

লোকগণনার রিপোর্টে প্রকাশ, বাঙ্গালী-পুরুষের মত বাঙ্গালী-মহিলার মৃত্যু সংখ্যাও খুব বেশী। ইহারও কারণ আমাদের মত মহিলারাও বিগড়াইয়া গিয়াছেন। সেকালের স্ত্রীলোকগণ এখনকার মত নাকে চসমা আঁটিয়া চেয়ারে বসিয়া পুস্তক পাঠে অভ্যস্তা থাকিতেন না। আগেকার পল্লীমহিলাগণ ধান ভানিতেন, জল তুলিতেন, বাসন মাজিতেন, আঙ্গিনা পরিস্কার করিতেন, রন্ধন করিতেন। এক কথায় সাংসারিক সমস্ত কাজই করিতেন। লেখাপড়ার প্রচলন সেকালে একালের মত বিস্তৃতি লাভ না করিলেও সেকালের স্ত্রীলোকেরা যে মোটেই লেখাপড়া জানিতেন না এমনও নহে। স্ত্রীলোকদিগেব যেটুকু লেখাপড়া দরকার, তখনকার স্ত্রীলোকগণ তাহা জানিতেন। তাঁহারা তাহাদের সাংসারিক কাজ শেষ করিয়া রাত্রে তাঁহাদের শিশুপুত্রদিগকেও পড়াইতেন। তাই সেকালের বালকগণ প্রথম ভাগও দ্বিতীয় ভাগ তাহাদের মাতার নিকট শেষ করিয়া তবে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে যাইত। এখন যেমন মহাত্মা গান্ধীর চেষ্টায় স্ত্রীলোকগণ চরকা কাটিতেছেন, পূর্ব্বেও স্ত্রীলোকেরা তাহা করিতেন। ফলকথা সে কালের বাঙ্গালী পুরুষ ও স্ত্রীলোক হিন্দুজাতির ধর্ম্ম ও কর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যেরূপ ভাবে কালক্ষেপ করিতেন, তাহাই ছিল বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যোন্নতির কারণ।

এখনকার মত তাই এত অসুখ বিসুখও সেকালে ছিল না। তখন একটু আধটু অসুখ যাহা করিত, তাহা সংসারের প্রাচীনা স্ত্রীলোকেরাই পাচন মুষ্টিযোগ দ্বারা আরোগ্য করিতে সক্ষমা হইতেন। এইজন্য এখনকার মত ১৬ টাকা ফিঃ দিয়া তখন ডাক্তার কবিরাজ দেখাইয়া হাওয়া বদলাইতে যাইবারও দরকার হইত না।

যাক—এখন কি করিলে বাঙ্গালী মরণের হাত হইতে নিষ্কৃতি পারে তাহাই আমাদের সর্ব্বাগ্রে আলোচ্য। স্বাস্থ্যোন্নতি করিতে হইলে বিলাসিতার মায়া বিসর্জ্জন দিতে হইবে। সে কালের কর্ম্মময় ভাব স্রোতে আবার বাঙ্গালা দেশকে প্লাবিত করিয়া তুলিতে হইবে। ধর্ম্ম-ভাব জাগাইয়া তুলিতে হইবে। বাঙ্গালী জাতির যুবকদিগকেই এ কার্য্যে অগ্রসর হইয়া এ কার্য্য সাধন করিতে হইবে। তাঁহারাই দেশের সম্পূর্ণ ভরসার স্থল। তাঁহাদিগকে এক এক জন প্রকৃত কর্ম্মী হইতে হইবে। প্রকৃত কর্ম্মীর লক্ষ্য কি?

'হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ।"

প্রকৃত কর্ম্মীর লক্ষ্য—হয় মৃত্যু না হয় সফলতা। যদি তুমি সফলতা লাভ কর রাজ্যলাভ করিবে, আর যদি তোমার মৃত্যু হয় স্বর্গলাভ করিবে।—অতএব দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় বলিতে হইবে,—

"অহং কর্ত্তা ঈশ্বরময় ভৃত্যবৎ করোমি" অর্থাৎ—আমি দাস, ঈশ্বর প্রভু, কর্ম্ম তাঁহার, আমি মাত্র সাধন মন্ত্র স্বরূপ। তাঁহারই প্রীতি বা প্রয়োজনের জন্য কর্ম্ম করিতেছি। এই গেল গেল কর্ম্মীর কথা। এই

কর্ম্মের সাফল্য সাধনের জন্ত আমাদিগকে কিন্তু সর্ব্বাগ্রে সংযম ব্রত- শিক্ষা করিতে হইবে। সকল ঋপু গুলির পরিচালন ব্যাপারেই আমাদিগকে সংযমের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে হইবে। আমাদিগকে খাদ্য প্রভৃতির বিচারের জন্ত আমাদের তৃতীয় ঋপুর সংযম শিক্ষা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। হোটেলের অখাদ্য-কুখাদ্য ভক্ষণ করিয়া জীবন নষ্ট করা কখন উচিত নহে। বিলাসিতার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উহা আমাদিগকে একেবারে বিসর্জ্জন করিতে হইবে। দেশের লোকে মোটা ভাত মোটা কাপড় যাহাতে সকলে খাইতে-পরিতে পায়—তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। মহিলাদিগকেও সাংসারিক কার্য্য, সন্তান পালন, স্বাস্থ্যরক্ষা প্রভৃতি শিক্ষা করিতে হইবে। দেশের স্ত্রীলোকগণ এ সব শিক্ষা করিলে তাহাদের গর্ভজাত সন্তানগণও অকাল মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইবে। এখন আমাদিগকে বাঁচিতে হইলে কি কি করা আবশ্যক তাহার তালিকা সংক্ষেপে প্রদান করিলাম।

১। বিলাসিতা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে হইবে।

২। মদ্যপায়ী ব্যক্তিদিগকে মদ্য ত্যাগ করিতে হইবে। অখাদ্য-কুখাদ্য ভোজন একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে।

৩। সহরের অলিতে গলিতে এক তলার বাড়ীতে ঘর ভাড়া লইয়া বাস ত্যাগ করিয়া পল্লীগ্রামে গিয়া বাস করিতে হইবে।

৪। পল্লীগ্রামগুলির জলাশয় সকলের পঙ্কোদ্ধার করিতে হইবে। গ্রামে জলাশয় না থাকিলে জলাশয় খনন করিতে হইবে।

৫। গ্রামের জঙ্গলগুলি প্রতি বৎসর পরিষ্কার করিতে হইবে। বাড়ীর আশে পাশের পগার বা নর্দ্দামার তলিতে যাহাতে জল নিকাশ হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

কৃষক দিগকে এ বিষয় উপদেশ দিতে হইবে—এরূপ করিলে তোমাকে মশায় কামড়াইবে না। তুমি সবল ও সুস্থ হইবে।

৬। প্রত্যেক গৃহগুলিতেই যাহাতে উপযুক্তরূপ আলোক ও বাতাস প্রবেশ করিতে পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৭। স্ত্রীলোকদিগকে দেশীয় টোটকা মুষ্টিযোগ গুলি শিক্ষা দিতে হইবে। যাহাতে তাঁহারা একটু আধটু অসুখ করিলে নিজ নিজ সন্তানদিগের চিকিৎসা নিজে নিজে করিতে সক্ষম হন তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে ও স্বাস্থ্যরক্ষা ও গৃহিনীপণা প্রভৃতি শিক্ষা দিতে হইবে। এরূপ করিলে বাঙ্গালার পল্লীগুলি আবার "সুজলা সুফলা মলয়জ শীতলা শস্য শ্যামলা"য় পরিণত হইতে কয়দিন লাগে? বাক্যে ইহা হইবার নয়। এ সম্বন্ধে বাক্য ব্যয় অনেক হইয়া গিয়াছে। উপদেষ্টার আসনে বসিয়া অনেকে এরূপ উপদেশ দিতে পারেন। এখন কর্ম্মের ও কর্ম্মীর দরকার। পূর্ব্বেই বলিয়াছি একার্য্য সাধন করিতে হইলে দেশের যুবকদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। দীর্ঘকাল অলসতায় দেশের লোকের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ভাই সব, তোমরা হতাশ হইলে চলিবে না। ব্রহ্মচর্য্য সাধনকর্ত্তার ন্যায় আমরাও এক সুরে সুর মিলাইয়া বলিতেছি,—

"Yet time serves wherein you may
redeem

Your banished honours, and
restore your selves.
In to the good thoughts of the
world.

"এখনও সময় আছে হও না হতাশ।
বিধির কৃপায়, শুধু পুণ্য এই দিন
উদিয়াছে শুভক্ষণে সম্মুখে তোমার,
যদি দাও মন, এখনও সাধনা প্রতি
হইবে নিশ্চয় জগতের বরণীয়।"

বাস্তবিক যদি যুবকগণ হতাশ না হইয়া এইরূপ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চয়ই জগতের বরণীয় হইবেন তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। তাঁহাদের নাম বাঙ্গালার ইতিহাসে চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু তাহাকে মনে করিতে হইবে।

"I slept and dreamt that life was
beauty.
I woke and found that life was
duty."

"ঘুমঘোরে দেখি স্বপ্ন, জীবনের খেলা,
শুধু শান্তি, শুধু সুখ,—সৌন্দর্য্যের লীলা।
নিদ্রাভঙ্গে কর্ম্মক্ষেত্রে হেরি চারিধার,—
কর্ত্তব্য —কর্ত্তব্য শুধু;—কঠোর সংসার।"

আশা করি দেশের যুবকগণ—

"অভ্যাসেন চ কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে"

এই মহাবাক্য স্মরণ করিয়া অগ্রসর হইলে শুভ ফল লাভ করিবেন। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি –

"বাঙ্গালার মাটি — বাঙ্গালার জল
রক্ষা হোক্ রক্ষা হোক্ হে ভগবান।"

কায়চিকিৎসা ক্রমোপদেশ বা
Practice of medicine.

(পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর)

——(:o:)——

বিষ্টম্ভাজীর্ণে "অগ্নিমুখ লবণ" একবার করিয়া ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। ইহার উপাদান—

চিত্রকং ত্রিফলা দন্তী ত্রিবৃতা পুষ্করং সমম্।
যাবন্ত্যেতানি চূর্ণানি তাবন্মাত্রন্তু সৈন্ধবম্।
ভাবয়িত্বা স্নুহীক্ষীরৈ স্নুহকাণ্ডে নিক্ষিপেৎ ততঃ।
মৃদু পঙ্কেনাঙ্গুলিপ্তং প্রক্ষিপেজ্জাত বেদসি॥
সুপক্কন্তু সমুদ্ধৃত্য সংচূর্ণ্যোষ্ণাম্বুনা পিবেৎ।

চিতামূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, দন্তীমূল, তেউড়ীমূল, এবং কুড় ইহাদের প্রত্যেকটির চূর্ণ সমভাগ এবং সমস্ত চূর্ণের সমান সৈন্ধব লবণ। সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশাইয়া সীজের ক্ষীর দ্বারা ভাবনা দিয়া সিজ বৃক্ষের কাষ্ঠ মধ্যে স্থাপন করিয়া মৃত্তিকা দ্বারা লেপ দিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে এবং দগ্ধ

হইলে তুলিয়া চূর্ণ করিয়া হইবে। মাত্রা এক আনা, অনুপান উষ্ণ জল।

ইহার উপদানগুলির মধ্যে—

চিতা—আগ্নেয়। হরীতকী—ত্রিদোষ-নাশক। আমলকী—কফবাতঘ্ন। বহেড়া—ত্রিদোষনাশক। দন্তী—ভেদক। ত্রিবৃৎ—ভেদক। কুড়—বায়ু ও কফনাশক। সৈন্ধব লবণ—ত্রিদোষ নাশক। সিজের ক্ষীর—

সেহুণ্ডো রেচন স্তীক্ষ্ণো দীপনঃ কটুকো গুরুঃ ॥
শূলমষ্ঠীলিকাধ্মান কফ গুল্মোদরনিলান্ ॥
উন্মাদ মোহ কুষ্ঠার্শঃ শোথ মেদোঽশ্ম পাণ্ডুতাঃ।
ব্রণ শোথ জ্বর প্লীহ বিষদূষী বিষং হরেৎ ॥
উষ্ণ বীর্য্যং স্নূহী ক্ষীরং স্নিগ্ধঞ্চ কটুকং লঘু।
গুল্মিনাং কুষ্ঠিনাঞ্চাপি তথৈবোদর রোগিনাম্ ॥
হিতমেতৎ বিরেকার্থে যেচান্যে দীর্ঘ রোগিণঃ।

ইহা রেচক, তীক্ষ্ণ, অগ্ন্যদ্দীপক, কটু ও গুরু। ইহা ব্যবহারে শূল, অষ্ঠিলিকা, আধ্মান, কফ, গুল্ম, উদররোগ, বায়ু, উন্মাদ, মূর্চ্ছা, কুষ্ঠ, অর্শ, শোথ, মেদোরোগ, অশ্মরী, পাণ্ডুরোগ, ব্রণ, শোথ, জ্বর, প্লীহা, বিষ ও দূষী বিষ নষ্ট হয়। ইহার নির্য্যাস উষ্ণ বীর্য্য, স্নিগ্ধ, কটু ও লঘু। ইহা গুল্ম, কুষ্ঠ ও উদর রোগ গ্রস্ত ব্যক্তিদের পক্ষে হিতকর, বিরেচক ও অন্যান্য চিররোগীর পক্ষেও উপকারক।

যে 'রামবান" নামক ঔষধটির কথা আমরা তরুণ জ্বরের প্রথমাবস্থায় প্রয়োগের ব্যবস্থা জ্বরাধিকারে বলিয়া আসিয়াছি, সেই "রামবান" সকল প্রকার অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্যের—বিশেষতঃ আমাজীর্ণ ও মন্দাগ্নির মহৌষধ। দোষানুসারে ইহার অনুপানের ব্যবস্থা করিতে হয়। ইহার উপাদানগুলি নিম্নে লেখা যাইতেছে—

পারদামৃত লবঙ্গ গন্ধকং ভাগযুগ্ম মরিচেন মিশ্রিতম্।
জাতীফলমথার্দ্ধ ভাগিকং তিন্তিড়ী ফল রসেন মর্দ্দিতম্।
মাষমাত্রমনুপান্ যোগতঃ সদ্যঃ এব জঠরাগ্নি দীপনঃ।

পারদ, বিষ, লবঙ্গ ও গন্ধক—প্রত্যেক দ্রব্য ২ তোলা, মরিচ ২ তোলা, ও জাতীফল অর্দ্ধ তোলা। এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া কাঁচা তেঁতুলের রসে বাটিয়া মাষ কলাই প্রমাণ বটিকা করিবে।

পারদ—ত্রিদোষ নাশক। গন্ধক—কফ বাতঘ্ন। বিষ—ত্রিদোষ নাশক। লবঙ্গ—গ্রাহী। মরিচ—দীপন। জাতীফল—গ্রাহী। কাঁচাতেঁতুলের রস—বায়ু নাশক।

যেখানে অজীর্ণ জন্য অধিক মল নিঃসরণ হয়, সেস্থলে "লবঙ্গাদিবটি" "অজীর্ণ কণ্টকো রসঃ" "অগ্নিকুমার রস" "হুতাশন রস" প্রভৃতি ঔষধ গুলিও ব্যবস্থা করিতে পারা যায়। নিম্নে ঐ ঔষধ কয়টির উপাদান লিখিত হইতেছে।

লবঙ্গাদি বটী।

লবঙ্গ শুণ্ঠী মরিচানি ভৃষ্ট সৌভাগ্য চূর্ণানি সমানি কৃত্বা।
ভাব্যাম্লপামার্গ হুতাশবারা প্রভূত মাংসাদিক জারণায় ॥

লবঙ্গ, শুঁঠ, মরিচ ও সোহাগা, প্রত্যেক দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ। একত্র মিশাইয়া আপাং ও চিতামূলের রসে ভাবনা দিয়া ২ রতি বটি। ইহা সেবন করিলে প্রভূত মাংসাদি জীর্ণ হয়।

এই ঔষধের উপাদান গুলির মধ্যে—লবঙ্গ—দীপন ও পাচক প্রভৃতি গুণ বিশিষ্ট। শুণ্ঠী—পাচক। মরিচ—দীপন।

সোহাগা—

টঙ্গনো বহ্নি কৃদ্রূক্ষ্যো [illegible] কফনাশনঃ।
স্ত্রীপুষ্প জননো রূক্ষো মূঢ়গর্ভ বিকর্ষণঃ ॥

ইহা অগ্নিকর; বলবর্দ্ধক, ক্ষত নিবারক, কফঘ্ন, রজঃপ্রবর্ত্তক, রুক্ষ ও মূঢ়গর্ভাকর্ষক।

আপাং—দীপন। চিতামূলের রস—আগ্নেয়, পাচক প্রভৃতি গুণ বিশিষ্ট।

অজীর্ণকণ্টকো রসঃ।

শুদ্ধসূতং বিষং গন্ধং সমং সর্ব্বং বিচূর্ণয়েৎ।
মরিচং সর্ব্বতুল্যং স্যাৎ কণ্টকার্য্যাঃ ফল দ্রবৈঃ॥
মর্দ্দয়েৎ ভাবয়েৎ সর্ব্বমেকবিংশতিবারকম্।
গুঞ্জামাত্রাং বটীংখাদেৎ সর্ব্বাজীর্ণ প্রশান্তয়ে॥

পারদ ১ তোলা, বিষ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, মরিচ ৩ তোলা। সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশাইয়া কণ্টকারীর ফলের রসে ২১ বার ভাবনা দিয়া ও মাড়িয়া লইয়া ১ রতি পরিমিত বটী করিবে।

এই ঔষধের উপাদান গুলির মধ্যে—

পারদ—ত্রিদোষনাশক। বিষ—ত্রিদোষ নাশক। গন্ধক—কফবাতঘ্ন। মরিচ—দীপন।

কণ্টকারীর ফলের রস—

কণ্টকারী ফলং তিক্তং কটুকং দীপনং লঘু।
রুক্ষোষ্ণং শ্বাস কাসঘ্নং জ্বরানিল কফাপহম্॥

কণ্টকারীর ফল তিক্ত, কটু, অগ্নিকারক, লঘু, রুক্ষ ও উষ্ণ। শ্বাস, কাস, জ্বর, বায়ু ও কফ ইহা দ্বারা দমিত হয়।

অগ্নিকুমারো রসঃ।

রসেন্দ্র গন্ধৌ সহ টঙ্কনেন সমং বিষং যোজ্যমিহ ত্রিভাগকম্।
কপর্দ্দ শঙ্খাবিহ নেত্রভাগৌ মরিচমত্রাষ্ট গুণং প্রদেয়ম্॥
সুপক্ক জম্বীর রসেন ঘৃষ্টঃ সিদ্ধো ভবেদগ্নিকুমাররসঃ॥

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, সোহাগা ১ ভাগ, বিষ ৩ ভাগ, কড়িভস্ম ৩ ভাগ, শঙ্খভস্ম ৭ ভাগ ও মরিচ ৮ ভাগ। সমস্ত চূর্ণ একত্র মিশাইয়া পক্ক জম্বীরের রসে বাটিয়া ২ রতি পরিমিত বটী করিবে। এই ঔষধটি অজীর্ণ জনিত অধিক ভেদ নিবারণের জন্ত প্রযুজ্য।

এই ঔষধের উপাদান গুলির মধ্যে—

পারদ—ত্রিদোষঘ্ন। গন্ধক—বায়ু ও কফ প্রশমক। সোহাগা—আগ্নেয় কিন্তু গ্রাহী। বিষ—ত্রিদোষ প্রশমক। কড়িভস্ম—গ্রাহী। শঙ্খভস্ম—দীপন ও গ্রাহী। জম্বীর রস—পাচক।

হুতাশনো রসঃ।

গন্ধেশ টঙ্কনৈকৈকং বিষমত্র ত্রিভাগিকম্।
অষ্টভাগস্ত মরিচং জম্বাম্ভো মর্দ্দিতং দিনম্॥

গন্ধক ১ ভাগ, পারদ ১ ভাগ, সোহাগা ১ ভাগ, বিষ ৩ ভাগ, মরিচ ৮ ভাগ। সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশাইয়া লেবুর রসে মাড়িয়া মুগের ন্যায় বটী করিবে।

এই ঔষধের উপাদান গুলির মধ্যে—

গন্ধক—কফবাতঘ্ন কিন্তু গ্রাহী। পারদ—ত্রিদোষঘ্ন। সোহাগা—আগ্নেয় কিন্তু গ্রাহী। বিষ—ত্রিদোষঘ্ন। মরিচ—দীপন কিন্তু গ্রাহী। লেবুর রস—পাচক।

শঙ্খ বটী ও মহাশঙ্খ বটী নামক ঔষধ দুইটিও অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্যের প্রসিদ্ধ ঔষধ। সকল আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকই এই ঔষধ দুইটী অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্যের প্রথম হইতেই ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। দুইটির উপাদানই নিম্নে লেখা যাইতেছে।

শঙ্খবটী।

চিঞ্চা ক্ষার পলং পটু ব্রজপলং নিম্বুরসে কল্কিতং
তস্মিন্ শঙ্খপলং প্রতপ্তমসকৃৎ সংস্থাপ্য শীর্ণাবধি॥
হিঙ্গু ব্যোষপলং রসামৃত বলীন্ নিক্ষিপ্য নিষ্কাংশিকান্
বদ্ধা শঙ্খবটী ক্ষয় গ্রহণীকারুক্ পক্তি শূলাদিষু॥

পট্‌ব্রজ পলং পঞ্চ লবণং মিলিত্বা পলম্।
হিঙ্গু শুণ্ঠী পিপ্পলী মরিচানামপি মিলিত্বা পলম্॥
রস বিষ গন্ধকানাং প্রত্যেকং নিষ্কং মাষ চতুষ্টয়ম্।
শঙ্খ গেঁড়ুয়াং বহ্নৌধ্মাত্বা নিম্বু রসে তপ্তাং—
নিক্ষিপেৎ যাবচ্চূর্ণীভূয়তদ্রসে পততি।
সর্ব্বচূর্ণমেকীকৃত্য নিম্বু রসেন রৌদ্রে
তাবদ্ ভাবয়েৎ যাবদম্লতা ভবতি।

তেঁতুল ছাল ভস্ম ৮ তোলা, পঞ্চলবণ সমভাগে মিলিত ৮ তোলা, শঙ্খ ভস্ম ৮ তোলা (শাঁখের গেঁড়ো অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া উষ্ণাবস্থায় লেবুর রসে নিক্ষিপ্ত করিয়া রৌদ্রে ভাবনা দিবে এবং অম্লাস্বাদ হইলে অন্যান্য দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া) হিং, শুঁঠ, পিঁপুল ও মরিচ সমভাগে মিলিত ৮ তোলা, পারদ গন্ধক ও বিষ—ইহাদের প্রত্যেকটী অর্দ্ধতোলা। সমুদয় দ্রব্য একত্র করিয়া লেবুর রসে মাড়িয়া ৪ রতি পরিমিত বটী করিবে।

এই ঔষধের উপাদান গুলির মধ্যে তেঁতুলছাল ভস্ম—আগ্নেয়। পঞ্চলবণ—সৈন্ধব—অগ্নিদীপক। সচল—আগ্নেয়। বিড়—দীপন। সামুদ্র—অবিদাহী। সান্তার—বায়ুনাশক। শঙ্খভস্ম—আগ্নেয়। হিং—আগ্নেয়। শুঁঠ—পাচক। পিঁপুল—ত্রিদোষঘ্ন। মরিচ—গ্রাহী। লেবুররস—দীপন।

মহাশঙ্খ বটী।

দগ্ধ শঙ্খস্য চূর্ণং হি তথালবণ পঞ্চকম্।
চিঞ্চিকাক্ষারকঞ্চৈব কটুত্রয়মেব চ॥
তথৈব হিঙ্গুকং গ্রাহ্যং বিষ গন্ধক পারদম্॥
অপামার্গস্য বহ্নেশ্চ কাথৈর্লিম্পাকজৈ রসৈঃ।
ভাবয়েৎ সর্ব্বচূর্ণং তদম্লবর্গৈর্বিশেষতঃ।
যাবৎ তদম্লতাং যাতি গুড়িকামৃতরূপিনী।
লোহতাবঙ্গ যুক্তা চেয়ং মহাশঙ্খ বটীস্মৃতা॥

শঙ্খ ভস্ম, পঞ্চলবণ, তেঁতুল ছালের ক্ষার ত্রিকটু, হিং, বিষ, পারদ ও গন্ধক; লৌহ ও বঙ্গ—এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে মিশাইয়া আপাং ও চিতামূলের কাথে, লেবুর রসে ও অম্লবর্গ (জামীর, বীজপূরক, টাবালবু, চুকা পালাঙ্গ, আমরুল, তেঁতুল, কুল ও করঞ্জ) দ্বারা যে পর্য্যন্ত অম্লরস উৎপন্ন না হয়, সে পর্য্যন্ত ভাবনা দিয়া ২ রতি পরিমিত বটি করিবে। এই শঙ্খবটীর সহিত লৌহ ও বঙ্গ মিলাইলে মহাশঙ্খবটী প্রস্তুত হয়।

ইহার উপাদান গুলির মধ্যে—শঙ্খভস্ম—আগ্নেয়। পঞ্চলবণ—সৈন্ধব,—আগ্নেয়। সচল—আগ্নেয়। বিড়—দীপন। সামুদ্র—অবিদাহী। সাম্ভার—বাতঘ্ন। তেঁতুল ছাল ভস্ম—আগ্নেয়। শুঁঠ—পাচক। পিঁপুল—ত্রিদোষঘ্ন। মরিচ—গ্রাহী। হিং—দীপন। বিষ—ত্রিদোষঘ্ন। পারদ—গন্ধক—কফ বাতঘ্ন। লৌহ—কফ পিত্ত নাশক, বয়ঃ স্থাপক প্রভৃতি গুণ বিশিষ্ট। বঙ্গ—পুষ্টিকারক। চিতামূলের কাথ—দীপন। লেবুর রস—আগ্নেয়। অম্লবর্গ—

জাম্বীর—(গোঁড়া লেবু)

জম্বীর মুষ্ণং গুর্ব্বম্লং বাতশ্লেষ্ম বিবন্ধনুৎ।
শূল কাস কফোৎক্লেশ ছর্দ্দি তৃষ্ণামদোষজিত।
আস্য বৈরস্যং হৃৎ পীড়া বহ্নিমান্দ্য ক্রিমীন হরেৎ।

ইহা উষ্ণ, গুরু, অম্ল, বাত শ্লেষ্মা নাশক ও বিবন্ধ নিবারক। ইহা শূল, কাস কফ, উপস্থিত বমন, বমি, তৃষ্ণা, আমদোষ, মুখ বৈরস্য, হৃৎপীড়া, অগ্নিমান্দ্য ও ক্রিমি নাশক।

বীজ পূরক (টাবা লেবু)—

বীজপূর ফলং স্বাদু রসেঽম্লং দীপনং লঘু।
রক্ত পিত্ত হরং কণ্ঠ জিহ্বা হৃদয় শোধম্॥
শ্বাস কাসারুচি হরং হৃদ্যং তৃষ্ণা হরং স্মৃতম্।

এই ফল স্বাদু, অম্ল, অগ্নি-দীপ্তিকারক লঘু, রুক্ষ ও তৃষ্ণা নাশক। ইহা দ্বারা শ্বাস কাস, অরুচি ও রক্ত পিত্ত রোগ উপশমিত, কণ্ঠ, জিহ্বা ও হৃদয় বিশোধিত হয়।

মধু কর্কটিকা (বাতাবি লেবু কিন্তু ইহাও একপ্রকার বীজপূরক)—

মধু কর্কটিকা স্বাদ্বী রোচনী শীতলা গুরুঃ।
রক্তপিত্ত ক্ষয় শ্বাস কাস হিক্কা ভ্রমাপহা॥

ইহা স্বাদু, রোচক, শীতল ও গুরু। ইহা রক্তপিত্ত, ক্ষয়রোগ, শ্বাস, কাস, হিক্কা ও ভ্রম রোগ উপশমিত করে।

চুকাপালঙ্গ (চুক্রিকা)

চুক্রাত্যম্লা ভৃশং স্বাদ্বী বাত ঘ্নী কফ পিত্তকৃৎ।
রুচ্যা লঘুতরা পাকে কটু চ নাতি রোচনী॥

ইহা অতিশয় অম্ল, স্বাদু, বায়ুনাশক, কফপিত্তকারক। রুচ্য, অতিশয় লঘু ও পাকে কটু, ইহা অধিক রোচক নহে।

আমরুল—আগ্নেয়। তেঁতুল—দীপন।

কুল—

কোলন্তু বদরং গ্রাহি রুচ্যমুষ্ণঞ্চ বাতলম্।
কফ পিত্ত করঞ্চাপি গুরু সারকমীরিতম্॥

ইহা গ্রাহী, রোচক, উষ্ণ, বায়ুজনক, কফ পিত্তকর, গুরু ও সারক।

করঞ্জ—বাতঘ্ন ও কফনাশক প্রভৃতি গুণ বিশিষ্ট।

"মহাশঙ্খবটী"—অগ্নিমান্দ্য এবং অজীর্ণের সকল অবস্থাতেই প্রয়োগ করা যায়। সাধারণতঃ অনুপান জল। ইহা অতিশয় পাচক ঔষধ, আকণ্ঠ ভোজন করিয়া ইহার এক বটিকা সেবন করিলে শীঘ্র জীর্ণ হইয়া যায়।

আর একপ্রকার "মহা শঙ্খ বটী" আছে, সেটির উপাদান—

পটু পঞ্চক হিঙ্গু শঙ্খ চিঞ্চাত্বগ্ভস্ম ব্যোষ বলীষ রসামৃতানি।
শিখি শেখরিকাম্লবর্গ নিম্বু দ্রবভাব্যানি যথাম্লতাং ব্রজন্তি।

পঞ্চ লবণ, হিং, শঙ্খ ভস্ম, তেঁতুলছাল ভস্ম, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, গন্ধক, পারদ ও বিষ,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ। চিতার কাথ, আপাঙ্গের কাথ, অম্লবর্গের রস ও লেবুর রস যে পর্য্যন্ত অম্ল রস উৎপন্ন না হয়, সে পর্য্যন্ত ভাবনা দিয়া ২ রতি পরিমিত বটী।

মৎস্য এবং মাংস বহু পরিমাণে ভোজন করিয়াও যদি কাঁজী পান করা যায়, তাহা হইলে সত্বরই জীর্ণ হয়। এ সম্বন্ধে ভাব মিশ্র আশ্চর্য্য হইয়া বলিতেছেন।

কিমত্র চিত্রং বহু মৎস্য মাংস ভোজী সুখী কাঞ্জিক পানতঃ স্যাৎ।
ইত্যদ্ভুতং কেবল বহ্নিপক্কো মাংসেন মৎস্যঃ পরিপাকমেতি।

অর্থাৎ মৎস্য, এবং মাংস বহু পরিমাণে ভোজন করিয়াও যদি কাঁজি পান করে, তবে সত্বরই জীর্ণ হয়, ইহা বিচিত্র নহে, কিন্তু কেবল মাত্র অগ্নিপক্ক মৎস্য—মাংস সহ ভক্ষণ করিলে জীর্ণ হয় ইহাই আশ্চর্য্য।

নিম্নে কতকগুলি দ্রব্য অন্য দ্রব্যের সাহায্যে সহজে জীর্ণ হইবার উপায় বলা যাইতেছে।

আমমম্র ফলং মৎস্যে তত্বীজং পিপিতে হিতম্।
কূর্ম্ম মাংসং যবক্ষারৈঃ শীঘ্রং পাকমুপৈতিহি॥
কপোত পারাবত নীল কণ্ঠ কপিঞ্জলানাং পিষিতানিভুক্ত্বা।
কাশস্য মূলং পরিপিষ্য পীতং সুখী ভবেন্না বহুশোহি দৃষ্টম্॥

অপক্ক আম্র দ্বারা মৎস্য এবং আম্রবীজ দ্বারা মাংস পরিপাক হয়। কচ্ছপের মাংস ভক্ষণে অজীর্ণ হইলে যবক্ষার দ্বারা জীর্ণ হইয়া থাকে।

শুক্লবর্ণ ও পাণ্ডুবর্ণ পায়রা, নীলকণ্ঠ এবং কপিঞ্জলের মাংস ভক্ষণ করিয়া অজীর্ণ হইলে কেশের মূল পেষণ করতঃ জলদ্বারা পান করিলে জীর্ণ হয়।

মাংসানি সর্ব্বাণ্যপি যান্তি পাকং ক্ষারেন সম্যক্তিল নালজেন।
চঞ্চুর সিদ্ধার্থক বাস্তুকানাং গায়ত্রিসারঃ কথিতেন পাকঃ॥

তিল গাছের সস্তঃক্ষার দ্বারা সর্ব্বপ্রকার মাংস পরিপাক হয়। চঞ্চুকশাক, শ্বেত সর্ষপ, এবং বাস্তুয়াশাক, এই সকল খদির কাষ্ঠের সার দ্বারা পরিপাক হয়।

পালঙ্কিকাকেবুককারবেল্লী বার্ত্তাকুবংশাঙ্কুর মূলকানাম্।
উপোদিকা লাবু পটোলকানাং সিদ্ধার্থ কো মেষরবশ্চ পক্তা॥

পালংশাক, কেবুক শাক, করলা, বেগুন, বাঁশের কোঁড়, মূলা, পুঁই, লাউ এবং পটোল —এই সকল দ্রব্য শ্বেত সর্ষপ ও মেষরব দ্বারা পরিপাক হয়।

বিপচ্যতে শূরণকং গুড়েন তথালুকং তণ্ডুল ধাবনেন।
পিণ্ডালুকং জীর্য্যতি কোদ্রবাৎ কশেরু পাকঃ কিলনাগরেণ
লবণ তণ্ডুল তোয়াৎ সর্পিজম্বীর কাম্বয়াৎ।
মরিচাদপি তচ্ছীঘ্রং পাকং যাত্যেব কাঞ্জিকাত তৈলম্।

শূরণ—গুড় দ্বারা এবং আলু—চেলোনি জল দ্বারা পরিপাক হয়। গোল আলু এবং কেশুর—শুঁঠ দ্বারা পরিপাক হয়। চেলোনি জল দ্বারা লবণ এবং গোঁড়া লেবু প্রভৃতি অম্লদ্বারা কিংবা মরিচ দ্বারা ঘৃত জীর্ণ হয় এবং কাঁজি দ্বারা তৈল জীর্ণ হয়।

ক্ষীরং জীর্য্যতি তক্রেণ তক্রাদ্যং কোকমগুকাৎ।
মাহিষং শনি মস্থেন শঙ্খ চূর্ণেন তদ্দধি।

তক্র দ্বারা দুগ্ধ পরিপাক হয়। ঈষদুষ্ণ মণ্ড দ্বারা গব্য দুগ্ধ এবং সৈন্ধব দ্বারা মহিষ দুগ্ধ জীর্ণ হয়। শঙ্খচূর্ণ দ্বারা মহিষ দধি জীর্ণ হইয়া থাকে।

রসালং জীর্য্যতি ব্যোষাৎ খণ্ডং নাগর ভক্ষণাৎ।
সিতা নাগর মুস্তেন তথেক্ষুশ্চাদ্রি কা রসাৎ।

ত্রিকটু ভক্ষণে কাঁটাল জীর্ণ হয়। শুঁঠী দ্বারা খাড়গুড় জীর্ণ হয়, নাগর মুথা দ্বারা চিনি জীর্ণ হয়, এবং আদার রস দ্বারা ইক্ষু জীর্ণ হইয়া থাকে।

জরামিরা গৈরিক চন্দনাভ্যামভ্যোতিশীত্রং মুনিভিঃ প্রদিষ্টং।
উষ্ণেন শীতং শিশিরেণ চোষ্ণং জীর্ণো ভবেৎ ক্ষারগণ স্তথা ম্লৈঃ।

গেরিমাটি এবং চন্দন দ্বারা পুরাতন মদ্য, উষ্ণ দ্রব্য দ্বারা শীতল দ্রব্য, শীতল দ্রব্য দ্বারা উষ্ণ দ্রব্য এবং অম্লরস দ্বারা ক্ষার সকল পরিপাক হয়।

তপ্তং তপ্তং হেম বা তারমগ্নৌ তোয়েক্ষিপ্তং সপ্তকৃত্বস্তদম্ভঃ।
পীতা জীর্ণত্যোর জাতং নিহন্ত্যাণ্ড ক্ষৌদ্রং তন্ত্রমুস্তং বিশেষাৎ।

জলপান করিয়া অজীর্ণ হইলে স্বর্ণ অথবা রৌপ্য ৭ বার অগ্নি সন্তপ্ত করিয়া ৭ বার জলে নিক্ষেপ করিবে। তাহার পর ঐ জল পান করিবে। নাগর মুথা ও মধু একত্র

সেবনেও জলপান জন্য অজীর্ণ নষ্ট হইয়া থাকে।

• পথ্যাপথ্য।

অজীর্ণে উপবাস এবং অনাহারে নিদ্রা সেবন যে বিশেষ হিতকর, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। নূতন এবং পুরাতন অজীর্ণে এ ব্যবস্থা মানিতেই হইবে।

পুরাতন অজীর্ণে একবেলা মিহি চাউলের অন্ন, টাটকা ও ক্ষুদ্র মৎস্য, কাঁচাকলা, কাঁচা পেপে, ডুমুর, গন্ধভাদুলে, বেগুন ও পটোলের তরকারি। রাত্রিতে সহ্য হইলে ঐরূপ ভাবে অন্নাহার এবং সাগু, বার্লি প্রভৃতি। ডাল একেবারেই না খাইলে ভাল হয়। নিতান্ত খাইলে মুগের দালের যূষ মাত্র। তরকারিও যত কম খাওয়া যায় ততই ভাল। তক্র, হিং, আদা ও লেবু অজীর্ণে বিশেষ উপকারক।

অজীর্ণ রোগে ঠিক এক সময়ে আহার করা একান্ত কর্ত্তব্য এবং আহারের সময় জল পান না করিয়া আহারের অন্ততঃ ২।৩ ঘণ্টা পরে জল পান করা উচিত।

ব্যায়াম এই রোগে বিশেষ উপকারক। অনুরূপ ব্যায়াম না করিয়া কেবল ২ বেলা ভ্রমণ করিলেও যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়।

অজীর্ণরোগীর পক্ষে ঘন ঘন জোলাপ লওয়া, ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ না হইতে আবার আহার করা, অধিক জলপান, এবং রাত্রি জাগরণ বিশেষ অনিষ্টকারী।

[ক্রমশঃ]

দিবোদাস।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায় কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ-বিদ্যাবিনোদ এইচ, এম-বি]

——:॰:——

পাচকগণ বলিল হে মহারাজ! আপনি ভগবান্ সহস্ররশ্মি প্রভাকর অপেক্ষাও সমধিক তেজস্বী। সর্ব্বভুক্ সুপ্রখর অনল অপেক্ষাও আপনার সমধিক প্রতাপ। সমরশাস্ত্রে আপনি অদ্বিতীয় সুপণ্ডিত। আপনি যদি দয়া করিয়া আমাদিগকে অভয় প্রদান করেন, তাহা হইলে আকস্মিক এই দুর্ব্বিপাকের বিষয় কথঞ্চিৎ বিজ্ঞাপন করি। রাজা প্রফুল্লবদনে ভ্রুভঙ্গি করিয়া অনুজ্ঞাদান করিলে মহানসের অধ্যক্ষগণ মৃদুভাবে নিবেদন করিল,—হে মহারাজ কোন্ মায়াবী শক্তিশালী শঠ মায়াবিদ্যা-বলে ভবদীয় প্রতাপশাসিত রাজপুরী হইতে হুতাশনকে বিদূরিত করিল তাহা আমরা অবগত নহি। অগ্নি অভাবে পাকক্রিয়া সম্পাদিত হইতে পারে না। তথাপি কখন কখন সূর্য্যের উত্তাপে তৎকার্য্য কথঞ্চিৎ সম্পাদিত

হওয়া সম্ভব। সেই প্রকারে যৎকিঞ্চিৎ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি; মহারাজের অনুমতি হইলে সম্মুখে উপস্থিত করি। লক্ষণ দেখিয়া আমরা ভাবিয়াছি যে, এ অবস্থায় অদ্যকার মত ইহাই উত্তম। সূপকারগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহামতি রাজা দিবোদাস মনে মনে চিন্তা করিলেন,—অসূয়াপরবশ কুচক্রী দেবগণেরই এই চক্রান্ত। এইরূপ চিন্তা করিয়া ক্ষণকাল তথায় উপবেশন পূর্ব্বক তপোবলসম্পন্ন রাজা তপোবলে দিব্য চক্ষু প্রভাবে দেখিতে পাইলেন কেবল গার্হস্থ্যঅগ্নি অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন এমন নহে, সেই সঙ্গে জঠরানল পর্য্যন্ত অন্তর্হিত হইয়াছে। তপোবলে ইহা রাজা পরিজ্ঞাত হইয়া পুনরায় চিন্তা করিলেন, ভগবান্ হব্যবাহন ইহলোক হইতে স্বর্গধামে প্রস্থান করুন অথবা এখানেই থাকুন তাহাতে আমাদের ক্ষতিই বা কি?—ন্যায়ানুসারে বিচার করিয়া দেখিলে বরং ইহাতে দেবগণেরই ক্ষতি হইল —কেননা তাঁহাদের কোপে আমার কিছুমাত্র হানি হয় নাই, দেবতারা কি মনে করেন যে, তাঁহাদের বলেই আমাদের কি রাজ্যাধিকার লাভ হইয়াছে? কমলাসন পিতামহ প্রজাপতির মহৎ গৌরবেই আমি এই রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছি। ভূমীন্দ্র-নরেন্দ্র দিবোদাস এইরূপ চিন্তা করিতেছেন ইত্যবসরে নগরস্থ জনপদ বর্গ সমভিব্যাহারে প্রতিহারী আসিয়া দ্বারদেশে উপস্থিত হইল। রাজা সেই সমাগত দ্বারস্থ প্রজাগণকে সমীপস্থ হইবার অনুমতি প্রদান করিলেন। সমাগত লোকেরা অনুজ্ঞাত হইয়া সেই ভূমীন্দ্র-নরেন্দ্রের সমীপে উপস্থিত হইয়া যথাযোগ্য উপহার প্রদান করিয়া প্রণিপাত করিল। রাজা তাহাদিগের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তিকে পরম সমাদরে মধুর বচনে সম্ভাষণ করিলেন। কাহারও প্রতি বা প্রফুল্ল নয়নে দৃষ্টিপাত করিলেন। হস্ত সঞ্চালন পূর্ব্বক কোন কোন ব্যক্তিকে উপবেশন করিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। এবং কোন কোন মাননীয় ব্যক্তিকে বহু সম্মানপূর্ব্বক আসন প্রদানের অনুমতি দিলেন। তাঁহারা সকলেই রাজপুরীস্থ সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গনে সুরতরু পারিজাত বিনিন্দিত সৌরভময় রত্নমণ্ডিত আসনে সপ্তশালাকা বিশিষ্ট সুমহৎ রাজদণ্ডের ছায়াতলে উপবেশন করিলেন। তপঃপ্রভাব সম্পন্ন নির্ভয় হৃদয় রাজা দিবোদাস এই সকল প্রজার বিরস বদন বিলোকন ও কাতরবচন শ্রবণ পূর্ব্বক তাহাদিগের অভিপ্রায় অবগত হইয়া কহিলেন, স্বার্থপরায়ণ দেবগণকে তোমাদের ভয় কি? আততায়ী দেবগণ যদিও এ স্থান হইতে হব্যবাহনকে আকর্ষণ করিয়া লইলেন, কিন্তু তাহাতেই বা আমাকে পরাভব করিবার ইষ্টসিদ্ধি কি হইল? হে পৌরবর্গ, পূর্ব্বে আমার এতৎ কার্য্য সাধনের অভিলাষ ছিল, কিন্তু দেবতারা এতকাল উপেক্ষা করিয়া বহু বিলম্বে ইহা স্মরণ করিয়াছেন। অগ্নি চলিয়া গিয়াছেন ভালই হইয়াছে, জগৎপ্রাণ বায়ুও চলিয়া যাউন, জলাধিপতি বরুণ এবং দিবাবিভাবরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চন্দ্রসূর্য্যও অবিলম্বে এ স্থান পরিত্যাগ করুন; —তপোবলে আমি স্বয়ই পর্জ্জন্যরূপ ধারণ পূর্ব্বক পৃথিবীকে বারিপূর্ণ করিয়া শস্যে পরিপূর্ণ করণানন্তর জানপদবর্গের হর্ষ সমুৎপাদন করিব। স্বয়ংই আমি তপঃপ্রভাবে ত্রিবিধ অগ্নির রূপ ধারণ পূর্ব্বক পাকযজ্ঞ ও দাহাদিক্রিয়া সম্পাদন করিব। অন্তর্ব্বহিশ্চর বায়ু

রূপ গ্রহণ করিয়া আমি সমস্ত প্রাণীর জীবন-দান করিব। সেই নির্ব্বোধ দেবতারা আমার রাজ্যের কি অনিষ্ট সংসাধন করিবেন? চন্দ্র সূর্য্য বিগমে গগনমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইলে তাঁহা-দের বিহনে কি মহীমণ্ডল প্রাণধারণ করিতে সমর্থ হইবেনা? হে পৌরবর্গ! তাঁহারা যখন রাহুগ্রস্ত হন তৎকালে কি পৃথিবীর লোকেরা জীবিত থাকে না? সকলঙ্ক ক্ষয়শীল চন্দ্রমার মহিমা কি? আমি স্বয়ং নিত্য, পূর্ণ, নিষ্কলঙ্ক সৌমমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সমস্ত প্রজাপুঞ্জকে প্রমুদিত করিব। সোমদেব আমাদের কুলের আদি পুরুষ, সুতরাং তিনি এখানে সুখে অবস্থান পূর্ব্বক যাতায়াত করিতে পারেন। তিনি একমাত্র জগতের আত্মা। বিশেষতঃ আমাদিগের কুলদেবতা। তিনি কাহারও অপকার করিতে জানেন না; এইটী তাঁহার উৎকৃষ্ট ব্রত।

স্কন্দদেব কহিলেন, হে অগস্ত্য! ম্রিয়মান পৌরবর্গ রাজা দিবোদাসের বাক্যরূপ সুধা পান করিয়া বিকসিত বদনে অক্ষুব্ধ চিত্তে স্ব স্ব আলয়ে প্রস্থান করিলেন। ত্রিলোকে তপস্তার অসাধ্য কি আছে? তপোবল বিশিষ্ট রাজা দিবোদাসও পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে সেই সেই মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক অনলার্ক-বিজয়ী জ্যোতিঃ ধারণ করিলেন। ইহা দর্শনে অসূয়া-জর্জ্জরিত দেবগণের হৃদয়ে সুতীক্ষ্ণ শল্য সংবিদ্ধ হইতে লাগিল।

ইতি স্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে দিবোদাসের প্রতাপবর্ণন নামক ত্রিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়॥

কাশীশ্বর দিবোদাসের ঐরূপ অলৌকিক তপস্থার প্রভাব ও অসামান্ত পরাক্রমের কাহিনী অখিল পুরাণাদিতে বিঘোষিত করিতেছে। তিনি বিষ্ণুর অংশাবতার ছিলেন তাহা স্বয়ংই সুশ্রুত সংহিতার সূত্র স্থানে ১৭শ শ্লোক বলিতেছেন, "অহং হি ধন্বন্তরি রাদিদেবো জরারুজামৃত্যুহরোঽমরাণাম্। শল্যাঙ্গমঙ্গৈ রপরৈরুপেতং প্রাপ্তোঽস্মি গাংভুয় ইহোপদে-ষ্টুম্।" আমিই ধন্বন্তরি, আমিই আদিদেব বিষ্ণু, অমরদিগের জরা, রোগ ও মৃত্যু আমিই হরণ করিয়া থাকি। এক্ষণে আমার পিতামহ কর্ত্তৃক বিভাগীকৃত শালক্যাদি সপ্তাঙ্গ সমন্বিত এই শল্যাঙ্গের উপদেশ দিবার জন্য অবনীতে অবতীর্ণ হইয়াছি। ধন্বন্তরি নির্ঘণ্টুর মঙ্গলাচরণে উক্ত হইয়াছে নমামি ধন্বন্তরি মাদিদেবং সুরাসুরৈর্বন্দিত পাদপদ্মম্। লোকে জরারুগ্‌ভয় মৃত্যুনাশং ধাতারমীশং বিবিধৌ-ষধীনাম॥"

সুর ও অসুরবৃন্দ কর্ত্তৃক যাঁহার পাদপদ্ম পূজিত হয়;—যিনি ত্রিলোকের জরা রোগ ও মৃত্যু নাশ করেন;—বিবিধ ঔষধের যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা, সেই আদি দেব বিষ্ণুর অবতার ধন্বন্তরি দিবোদাসকে প্রাণাম করি।

ইহা দিবোদাসের কোন শিষ্যের বলিয়া মনে হয়, কারণ ধন্বন্তরিনির্ঘণ্টুর ষষ্ঠ বর্গের অন্তঃশ্লোকে আছে "দ্রব্যাবলিঃ সমাদিষ্টা ধন্বন্তরি মুখোদ্‌গতাঃ।" মহারাজ দিবো-দাস যে বিষ্ণুর অবতার এবং অতি ধার্ম্মিক ছিলেন, তাহা ইহার দ্বারাই বোধগম্য হয়। এবং স্কন্দপুরাণের কাশিখণ্ডের প্রথমে মহাদেব ব্রহ্মাকে বলিতেছেন হে বিধে! আমি মায়ার সাহায্যে এই মুহূর্ত্তেই বারাণসীতে গমন করিতে পারি। কিন্তু ধর্ম্মময় রাজা দিবোদাসকে উল্লঙ্ঘন করিবনা, বলিয়াই যাইবনা। তুমি নির্ব্বিঘ্নে কাশীতে গমন কর, ব্রহ্মা এইরূপে

মহাদেব কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া সানন্দে আনন্দ ধামে উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মা কাশিদর্শনে আনন্দিত হইয়া, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বেশ ধারণ পূর্ব্বক দিবোদাসের সন্নিধানে গমন করতঃ তাঁহাকে সজল সাক্ষত হস্তে আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরে রাজা প্রণাম করিয়া স্বহস্তে আসন দিলে তাহাতে তিনি উপবেশন করিলেন। রাজা দিবোদাস অভ্যুত্থান ও আসনাদির দ্বারা ব্রাহ্মণের সৎকার করিলে দ্বিজরূপধারী বিধাতা কহিতে লাগিলেন, "হে রাজন্ বহুকাল হইতে আমি আপনার রাজ্যে বাস করিতেছি, হে অরাতি সুদন! তুমি আমাকে না বলিলেও আমি তোমাকে সবিশেষ অবগত আছি। আমি বহুতর রাজাকেই দেখিয়াছি—যাঁহারা সকল যুদ্ধেই জয়লাভ করিয়াছেন। যাঁহাদের কর্ত্তৃক সদক্ষিণ যজ্ঞচয় অনুষ্ঠিত হইয়াছে; যাঁহারা জিতেন্দ্রিয়, জিতষড়বর্গ, সুশীল, সাত্বিক, বিদ্বান, রাজনীতিজ্ঞ দয়া ও দাক্ষিণ্য গুণের আধার, সত্য ব্রত পরায়ণ, সহিষ্ণুতায় ধরণীতুল্য, গাম্ভীর্য্যে সাগর সদৃশ, শূর, সৌম, জিতক্রোধবেগ ও পরম সুন্দর ছিলেন। হে মহারাজ! তোমার মত কোন রাজাই প্রজা গণকে আত্মপরিজনের ন্যায় বোধ করেন না। ব্রাহ্মণদিগের উপর দেবতা বুদ্ধি ও নিয়ত তপস্যার অনুষ্ঠান তোমা ভিন্ন কোন রাজারই দেখি নাই। হে দিবোদাস, তুমিই ধন্য মান্য, ও অশেষ গুণাধার, যে হেতু তোমার শাসনে কেহ অপথে পদার্পণ করেন না। হে রাজন! আমরা নিস্পৃহ ব্রাহ্মণ; কোন স্বার্থ রাখিয়া তোমার স্তব করিতেছিনা। তোমার সাধুগীত গুণরাশি আমাকে স্তব করাইতেছে। এক্ষণে সে সকল কথা নিষ্প্রয়োজন, সম্প্রতি আমার আগমণের কারণ বলিতেছি শ্রবণ কর। হে নৃপাল! আমার একটা যজ্ঞ করিবার বাসনা হইয়াছে। কিন্তু উহা সম্পূর্ণরূপে তোমার সাহায্যের অপেক্ষা করিতেছে। হে রাজন! এই জগৎ তোমার অবস্থানেই সরাজক ও সুখসমৃদ্ধ হইয়াছে। অধিক কি, আমি ক্ষুদ্র প্রজা হইয়াও তোমার রাজ্যে ন্যায়ানুসারে ধর্ম্মার্জ্জন করিয়া সুখে কালযাপন করিতেছি। তোমার এই নগরী কাশী—পৃথিবীর সকল স্থান হইতেই শ্রেষ্ঠ। কারণ এ স্থানে যে কোন কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, বহুযুগে তাহার ফল ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। কাশীতে মানবগণ সুনীতিরূপ সুমার্গে বিচরণ করিয়া ন্যায়ার্জ্জিত ধন সৎপাত্রে প্রতিপাদন না করিলে কদাচ চরম সময় শুভফল লাভ করিতে পারে না। হে মহারাজ! এই কাশীর মহিমা একমাত্র জ্ঞানদাতা সতীনাথই অবগত আছেন। হে মহারাজ, আমার বিবেচনায় এ সংসারে তোমার মত ধন্য পুরুষ আর নাই। কারণ তুমি জন্মান্তরের পুণ্য প্রভাবে ইহজন্মে দ্বিতীয় কাশীনাথের ন্যায় এই কাশী নগরীর পালক হইয়াছ। ত্রিজগৎখ্যাতা এই পুরীকে আর্য্যগণ বেদত্রয়ের সার বলিয়া গণ্য করিয়া থাকেন। এবং তাঁহারা সংসারের সারভূমি এই কাশী ত্রিবর্গ হইতেও উৎকৃষ্ট মোক্ষ প্রদান করে বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কাশীস্থ এক ব্যক্তিকে প্রতিপালন করিতে পারিলেও ত্রিভুবন রক্ষার ফল হয়। তুমি একক সেই সমগ্র কাশীকে প্রতিপালন করিতেছ। ইত্যাদি বলিয়া ব্রাহ্মণ বাক্যাবসান করিলে রাজা দিবোদাস তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। হে দ্বিজবর, আপনি যাহা বলিলেন, সে সকল আমি

হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। আপনি জানুন আমি আপনার দাস। আপনি যজ্ঞ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন তাহাতে যাহা যাহা প্রয়োজন হয়—সকলই আমার কোষাগার হইতে লইয়া যান। আমার সপ্তাঙ্গ রাজ্যে যাহা কিছু আছে, সে সকলেরই আপনি প্রভু। আপনি যজ্ঞারম্ভ করুন ও আপনার যজ্ঞীয় বস্তু সকল উপস্থিত হইয়াছে বলিয়াই মনে করুন। হে দ্বিজ! আমি স্বার্থানুসন্ধান না করিয়াই এই সাম্রাজ্য লালন পালন করিতেছি। আমি পুত্র, স্ত্রী ও স্বদেহের দ্বারা পরকে উপকৃত করিবার জন্যই চেষ্টা পাইয়া থাকি। মনস্বিগণ নৃপতিদিগের যজ্ঞানুষ্ঠান ও তীর্থসেবাদি হইতে প্রজাপালনকেই পরম ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রজাদিগের সন্তাপানল রাজার পক্ষে বজ্রাগ্নি হইতেও বিষম, কারণ বজ্রাগ্নি দুই বা তিন ব্যক্তিকেই দগ্ধ করিয়া শান্ত হয়, কিন্তু প্রজা-সন্তাপানল রাজ্যকুল ও শরীরকে দগ্ধ না করিয়া নিবৃত্ত হয় না। হে দ্বিজবর! আমার অবভৃত স্নান করিবার ইচ্ছা হইলে ব্রাহ্মণের পাদোদকেই স্নান করিয়া থাকি। আমি হোম করিতে অভিলাষী হইয়া বিপ্রমুখেই অর্পণ করিয়া থাকি ও ঐ হবনকে যজ্ঞ কার্য্য হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ করিয়া থাকি। আমার বহুদিন হইতে অভিলাষ ছিল, কোন যাচক আসিয়া আমার প্রাণ পর্য্যন্ত প্রার্থনা করিলেও বিমুখ করিবনা। আজ সামান্য বস্তুর যাচক হইয়া আমার গৃহে পদার্পণ করায় আমার সেই মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে। হে দ্বিজবর! আপনি ভূরিদক্ষিণযাগের আরম্ভ করুন, সকল বিষয়েই আমার সাহায্য পাইয়াছেন বলিয়া বোধ করুন। বিধাতা মতিমান রাজা দিবোদাসের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া আনন্দলাভ করতঃ যাবতীয় দ্রব্য সম্ভার আহরণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে দিবোদাসের সাহায্যে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক কাশীতে দশটী অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বারাণসীতে যেস্থানে ব্রহ্মার অশ্বমেধ যজ্ঞ, হইয়াছিল, অদ্যাপি সেই স্থান পরম পবিত্র দশাশ্বমেধতীর্থ বা দশাশ্বমেধঘাট নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

বিষ্ণুপুরাণের ৪র্থ অংশে ৮ম অধ্যায়ে দিবোদাসের বংশাবলী যাহা বর্ণিত আছে তাহাতে হরিবংশেরই সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন স্থলে মাত্র নামের পার্থক্য আছে। যথা—

পরাশর উবাচ—

কাশস্য কাশীরাজ ততোদীর্ঘতমা পুত্রোহভবৎ। ধন্বন্তরিস্তু দীর্ঘতমসোহভূৎ স হি সংসিদ্ধ কার্য্যকারিণঃ। সকল সম্ভূতিষ্বশেষ জ্ঞানবিৎ। ২। ভগবতী নারায়ণেনচ অতীত সম্ভূতা বস্মৈ বরো দত্তঃ। ৩। কাশীরাজ গোত্রেহবতীর্য্যাস্ত্বমষ্টধা সম্যগায়ুর্ব্বেদং করিষ্যসি যজ্ঞ ভাগং ভবিষ্যসি ইতি। ৪। তস্য চ ধন্বন্তরে ৪ পুত্রঃ কেতুমান। কেতুমতো ভীমরথঃ তস্যাপি দিবোদাসঃ, ততঃ প্রতর্দ্দনঃ। স চ মদ্রশ্রেণ্যবংশ স বিনাশ দশেষাঃ শত্রবোহনেন জিতা ইতি শত্রুজিদ্দ ভবৎ। ৫।

মহাভারতে দিবোদাসের পিতার নাম সুদেব বলিয়া দেখা যায়। পিতার মৃত্যুর পর দিবোদাস রাজা হন। ইহাঁর পিতৃশত্রু বীতহব্যের পুত্রগণ আসিয়া ইহাঁর সহিত যুদ্ধ করতঃ ইহাঁকে পরাস্ত করিলে ইনি মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে আশ্রয় লন। মহর্ষি ভরদ্বাজ

ইহার জন্য যজ্ঞ করেন; সেই যজ্ঞের প্রভাবে ইহার পুত্র প্রতর্দ্দনের জন্ম হয়। এই প্রতর্দ্দন পরে বীতহব্যের পুত্রগণের বিনাশ সাধন করেন। ইহা মহাভারতে অনুশাসন পর্ব্বে ত্রিংশ অধ্যায়ে দেখা যায়।

মহাভারত পাঠে আরও জানা যায়,—মহারাজ দিবোদাস ভরদ্বাজের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন, ইনি অবশ্য আমাদের পূর্ব্ব-কথিত হরিবংশস্থ ভরদ্বাজ নহেন। পুরাণ সকল পর্য্যালোচনায় আমরা দুইজন ভরদ্বাজকে দেখিতে পাই। প্রথম ভরদ্বাজ ভরতের পুত্র; মহর্ষি ভরদ্বাজ তিনি ত্রেতা ও দ্বাপরযুগে বর্ত্তমান ছিলেন। সেই মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমেই ভগবান্ রামচন্দ্র বনবাসের পথে এক রাত্রি অবস্থান করিয়াছিলেন এবং এই আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য মহর্ষি ভরদ্বাজের নিকটেই দ্বিতীয় ধন্বন্তরি অর্থাৎ রাজর্ষি দিবোদাসের প্রপিতামহ কাশীরাজ ধন্বন্তরি আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া অষ্টধা বিভক্ত করেন। আর দ্বিতীয় ভরদ্বাজ বৃহস্পতির ঔরসপুত্র এবং উতথ্যের ক্ষেত্রজ পুত্র জারজ ভরদ্বাজ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন। এই ভরদ্বাজের বিষয় মহাভারত বলিতেছেন—"তমুবাচ ভরদ্বাজো শ্রেষ্ঠপুত্রো বৃহস্পতেঃ।" এবং ইঁহার বিষয় লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় তাঁহার সম্বন্ধনির্ণয় নামক গ্রন্থে বিশেষভাবে বিবৃত করিয়াছেন। এই ভরদ্বাজেরই বংশধরেরা ভরদ্বাজ গোত্রজ ব্রাহ্মণ আখ্যায় অভিহিত। এবং ইঁহারই আশ্রমে দিবোদাস আশ্রয় লইয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

প্রাচীন চিকিৎসকের টোট্‌কা ও মুষ্টিযোগ।

(শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র লাহিড়ী)

—:*:—

আগুণে পোড়ায়।—লঙ্কার পাতা বাটিয়া পোড়া জায়গায় প্রলেপ দিলে জ্বালা নিবারণ হয়। (২) কলা ও আলু একত্র বাটিয়া প্রলেপ দিলেও বেশ ফল হয়। (৩) ইক্ষুগুড়, রেড়ীর তৈল ও চূণের জল একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে জ্বালা নিবারিত হয় ও ঘা আরোগ্য হয়। (৪) খড়ের ঘরের পুরাতন খড়, (যাহা নাড়িলে নিজেই ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হয়) আগুণে পোড়াইয়া, তাহাতে পাকা বেগুন পাতার চূর্ণ মিশাইয়া মধু সহ প্রয়োগ করিলে উত্তম ফল দর্শে। (৫) মসিনার তৈল ও মধু একত্র মিশাইয়া তাহাতে হরীতকীর চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে পোড়া ঘা শুষ্ক হয়।

সর্ব্বপ্রকার ঘায়ে।—৴০ এক ছটাক আলকাতরায় ৴২ সের গরম জল মিশাইয়া প্রত্যহ ক্ষতস্থান ধৌত করিলে সত্বর ক্ষত আরোগ্য হয়।

আধকপালী মাথা ব্যথায়।—গোল মরিচ

১০টা, শ্বেত চন্দন ১ তোলা, অশ্বগন্ধার শিকড় ৭॥০ তোলা, দারুচিনি ও সৈন্ধব লবণ একত্র ছাগ দুগ্ধে বাটিয়া কপালে প্রলেপ।

আমাশয়ে।—খয়ের ৴০ আনা, শ্বেতধুনা ৴০ আনা, কালজীরা ভাজার চূর্ণ।০ সিকি, কুড়চীর ছাল সিদ্ধ জল ৴৵০ পোয়া, একত্র মিশ্রিত করিয়া ১ তোলা পরিমাণ দিনে ২।৩ বার সেবন করিলে পেটের ব্যথা ও আমাশয় আরোগ্য হয়।

প্রসবান্তে পেটের ব্যথায়।—১তোলা, সোরা ৴০ ছটাক জলে ভিজাইয়া একখানি পরিষ্কার নেকড়া তাহাতে ডুবাইয়া সেই খানা নীচ পেটের উপর বসাইয়া দিলে নিশ্চয়ই উপকার হয়। (২) যবক্ষার চূর্ণ ৫ রতি, সোরা ২ রতি একত্র মিশ্রিত করিয়া মধু সহ খাইতে দিলেও বেশ ফল হয়।

পেট ব্যথায়—চূণের জল, কর্পূর ও যোয়ানের চূর্ণ একত্র মিশাইয়া খাইলে বেশ ফল হয়।

বহুমূত্রে।—কালজামের আঁটীর ভিতরের শাঁস।০ সিকি, যজ্ঞ ডুমুরের বীজচূর্ণ ৵০ আনা শোধিত অহিফেন ২ রতি একত্র মিশাইয়া কাঁচা আমলকীর রসে ছায়াতে ভাবনা দিয়া ও শুষ্ক করিয়া ২টী বটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। সন্ধ্যার পর গরম দুগ্ধ সহ খাইতে হইবে।

হৃদ্রোগে।—অর্জ্জুন ছালের চূর্ণ।০ সিকি, জটামাংসী ।০ সিকি, বাসকের ছালের চূর্ণ ৵০ আনা একত্র মিশ্রিত করিয়া গরম দুগ্ধ ও মধু সহ অথবা গরম দুগ্ধ ও হরিণের শিংচূর্ণ (পুট পাকে) একত্র মিশ্রিত করিয়া খাইবে।

শোথে।—কুলেখাড়ার ক্ষার ॥০ তোলা, যবক্ষার ৴০ আনা, পুনর্ণবার চূর্ণ ১০ রতি একত্র মিশ্রিত করিয়া বেলের পাতার রস গরম করিয়া ও সৈন্ধব লবণ সহ খাইবে। যদি সহ্য না হয় তবে কুলেখাড়ার ক্ষার ।০ সিকি পরিমাণ লইতে হইবে।

রতিশক্তি হীনতায়।—সিদ্ধি চূর্ণ ১, মৃগনাভী ১, বাবলার ছালের চূর্ণ ২, আরবীগঁদ ১, আলকুশী বীজ চূর্ণ ৪ ভাগ, একত্র মিশ্রিত করিয়া আরবী গঁদের জলে কাবাব চিনির চূর্ণ ৵০ আনা দিয়া প্রত্যহ ১ বার সেবন করিতে করিতে লইবে। (২) চড়ুই পাখীর মাংস ঘৃতে ভাজিয়া খাইবে অথবা সরুই পুঁটী মাছ (টাটকা) ঘৃতে ভাজিয়া খাইলেও বেশ ফল হয়।

কয়েকটী প্রয়োজনীয় কথা।

[ডাঃ শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাস]

—:০:—

১। গতিচিত্র।—কেহ কেহ বলেন যে, গতি চিত্রদ্বারা দৃষ্টিশক্তির ব্যত্যয় ঘটে। যাঁহারা বায়স্কোপ দর্শনে অত্যাসক্ত তাঁহাদের দৃষ্টিশক্তি শীঘ্রই খারাপ হইয়া পড়ে। এক সেকেণ্ডের মধ্যে ২০।৩০টী চিত্র ক্রমান্বয়ে চক্ষুর সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাওয়াতে দৃষ্টিবিভ্রম হইয়া যেন

একটা গতিশীল সজীব চিত্রবৎ অনুভূত হয়। এই চিত্রগুলি শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণের। শ্বেত বর্ণের কোন রশ্মি নাই, ইহা সপ্তরশ্মির সমন্বয় মাত্র এবং কৃষ্ণবর্ণেরও কোন রশ্মি নাই, ইহাতে সকল রশ্মির অভাব। সপ্তরশ্মি সমদ্ভুত ইথরের প্রকম্পন ও প্রকম্পনাভাব এত অত্যল্প সময়ের মধ্যে এত দ্রুত চক্ষে প্রবেশ করায় দর্শনপট বা Netina এবং দর্শন স্নায়ু বা optie nerve হীনবল হইয়া পড়ে। ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক বিদ্যালয়ে অধুনা এই গতিচিত্র প্রদর্শন দ্বারা শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। ইহাতে সুকুমার বালকদের দৃষ্টিহানি হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু ব্যবসায়ের পক্ষে ইহা বেশ লাভজনক বটে। ইহার এক দিকে বায়স্কোপের স্বত্বাধিকারিগণও লাভবান হইতেছেন, অপরদিকে ইহা চসমা বিক্রেতাদিগের ও মাহেন্দ্র সুযোগ!

২। দন্ত সম্বন্ধে দুই একটী কথা।—সূক্ষ্ম শুভ্রবর্ণ ময়দা অপেক্ষা লাল আটা দন্তের পক্ষে হিতকর। লাল আটা খাইলে দাঁত দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, কিন্তু শুভ্র ময়দায় ইহার ঠিক বিপরীত।

যাঁহারা মাংস অধিক খান তাঁহাদের দাঁত শীঘ্র পড়িয়া যায়। কিন্তু প্রাণীভোজী জন্তুদের দাঁত প্রায় পড়ে না। ইহার কারণ, তাহারা তাহাদের ভক্ষ্যপ্রাণীর অস্থি চিবাইয়া খায়। অস্থিচর্ব্বন ও ভক্ষণ দ্বারা তাহাদের রক্তে অস্থির উৎপাদন সকল অধিক পরিমাণে প্রবিষ্ট হওয়ায় দন্তের পরিপুষ্টি সাধিত হয়।

প্রতিবার আহারের পর দন্তধাবন ও দন্তের দৃঢ়তা সংরক্ষণের একটী উৎকৃষ্ট উপায়।—অনেক সময় ভুক্তপদার্থের ক্ষুদ্রক্ষুদ্র অংশগুলি দাঁতের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকে। উহার পচন দ্বারা দন্তের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। আহারের অব্যবহিত পরেই ঐগুলি বাহির করিয়া ফেলিলে দন্তের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকা সম্ভব।

৩। শৈথিল্য ও দৈন্য।—শৈথিল্য ও দৈন্য উভয়েই স্বাস্থ্যহানির কারণ। দৈন্যের দ্বারা পুষ্টিসাধক আহারের অভাবে বা অল্পাহারে বা অনাহারে যেমন শরীর ধ্বংস হয়, সেইরূপ আবার শৈথিল্য বশতঃ অতি ভোজন, গুরু ভোজন, বিরূদ্ধভোজন ও অযথা ভোজন জনিত অজীর্ণাদি রোগ উৎপন্ন হইয়া শীঘ্র স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া পড়ে। অতিরিক্ত অযথা আমোদ প্রমোদ ও শ্রমাভাব বশতঃ শৈথিল্য ব্যক্তির স্বাস্থ্যহানী হয়। তদ্রূপ প্রমোদাভাব, নিরানন্দ, বিষণ্ণতা ও অতিরিক্ত ক্লান্তিদায়ক শ্রমদ্বারা দীনব্যক্তির স্বাস্থ্যনাশ হয়। উপযুক্ত পরিচ্ছদাভাবে তাপ-শৈত্যের সমন্বয় রক্ষা করিতে অসমর্থ হওয়ায় দরিদ্রের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়; ত্যাগীব্যক্তিগণ ভস্মাদি লেপন দ্বারা এই সমন্বয় রক্ষা করেন বটে, কিন্তু দরিদ্র গৃহীর পক্ষে উহা অসম্ভব। অপরদিকে আবার ধনী ব্যক্তির অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সর্ব্বদা পরিচ্ছদাবৃত থাকায় সূর্য্যালোকের সহিত সংঘর্ষ হইতে না পারায় সংক্রামক রোগসমূহ কর্ত্তৃক আক্রমণপ্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

৪। বহুকালের বাসি রুটি। নেপলস নগরের মিউজিয়ম্ গৃহে অষ্টাদশ শতাধিক বর্ষের পর্য্যুসিত রুটি আছে। ঐ রুটি খৃষ্টীয় ৭৯ সালের আগষ্ট মাসে প্রস্তুত হইয়াছিল। কথিত আছে, পম্পি নগরে যে সকল বহু প্রাচীন উনান বা পাঁজা দেখিতে পাওয়া যায়,

তাহারই একটীতে এই রুটি প্রস্তুত হইয়াছিল। নেপলসের মিউজিয়ন্ গৃহের উপর তালায় একটী কাঠের আলমারিতে ঐ রুটি রক্ষিত আছে। উহার গঠন ঠিক সাধারণ রুটির মত, কিন্তু বর্ণ কয়লার মত। প্রস্তুতকালে অবশ্য উহা শুভ্রবর্ণ ছিল। বহুকাল রক্ষিত হওয়ায় বায়ুস্থ অম্লজান সংযোগে উহা কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গিয়াছে।

"প্রবাসী"র অন্যায় সমালোচনা।

[কবিরাজ শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরত্ন]

—:•:—

মান্যবর—

শ্রীযুক্ত "আয়ুর্ব্বেদ"-সম্পাদক

মহাশয় মান্যবরেষু—

মহাশয়! গত ১৩২৭ সনের ফাল্গুন মাসের "প্রবাসী নামক" মাসিক পত্রে বহু উপাধিধারী শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ চন্দ্র ভিষগাচার্য্য পূর্ব্ববঙ্গের খ্যাতনামা প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ সুচিকিৎসক কবিরাজ শ্রীযুক্ত হরিমোহন দাশগুপ্ত কবিরত্ন প্রণীত "আয়ুর্ব্বেদীয় ধাত্রীবিদ্যাসংগ্রহ" নামক পুস্তকের সমালোচনায় উক্ত পুস্তকের বঙ্গানুবাদে কোন কোন স্থলে ভুল হইয়াছে বলিয়া লিখিয়াছেন। বস্তুতঃ তাহা গ্রন্থকারের ভুল নহে, সমালোচকেরই ভুল।

সেইজন্য প্রবাসী পত্রেই সমালোচনার প্রতিবাদ পত্র প্রমাণ প্রয়োগ সহ লিখিয়া পাঠাইয়াছিলাম কিন্তু নিতান্ত দুঃখের সহিত লিখিতে বাধ্য হইতেছি যে, তিনি সেই প্রতিবাদ পত্র খানা প্রকাশ করিতে অসম্মত হইয়া উহা ফেরৎ পাঠাইয়া দিয়াছেন এবং তৎসঙ্গে উক্ত পত্রের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু সতীশ চন্দ্র সেন মহাশয়ের স্বাক্ষর যুক্ত একখানা পত্রে এইরূপ লিখিত হইয়াছে যে—"ক্ষমা করিবেন, আমরা এ বিষয়ে বাদ প্রতিবাদে প্রযুক্ত হতে রাজি নই।"

ইহা কি নিরপেক্ষ সম্পাদকোচিত কার্য্য হইয়াছে?

প্রবাসী সম্পাদক মহাশয় বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও ন্যায় পরায়ণ বলিয়াই শুনিয়া আসিয়াছি, তিনি যে কেন এই সামান্য বিষয়ে ন্যায়ানুমোদিত নিরপেক্ষ সম্পাদকীয় কর্ত্তব্য-সম্পাদনে পরাঙ্মুখ হইলেন তাহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। *

---

* "প্রবাসী"-সম্পাদক মহাশয়ের ইহা শুধু নিরপেক্ষতার অভাব নহে। ইহা বাস্তবিকই অতি অসঙ্গত কার্য্য। তবে এবিষয়ের মূলেই অসঙ্গতি, কারণ "প্রবাসীতে প্রবাসীর অনধিকার চর্চ্চা আয়ুর্ব্বেদীয় পুস্তকের সমালোচনায় হস্তক্ষেপ করা। আমরা অনেক সময়ই 'প্রবাসী"তে আয়ুর্ব্বেদীয় পুস্তকের সমালোচনা বহির্ হইলে হাস্য সম্বরণ না করিয়া

যাহা হউক উক্ত ভিষগাচার্য্য মহাশয়ের কৃত অনুচিত সমালোচনার প্রতিবাদ প্রকাশ না করিলে সাধারণের মনে অকারণে ভুল ধারণা ও বৃথা সন্দেহ বদ্ধমূল থাকিতে পারে বলিয়া আপনার নিকট উক্ত প্রতিবাদ-পত্র পাঠাইলাম, আশাকরি আপনি নিরপেক্ষ সম্পাদকীয় কর্ত্তব্যর অনুরোধে এই প্রতিবাদ পত্র যথাযথ ভাবে প্রকাশিত করিয়া নিরপেক্ষ কর্ত্তব্য পালন পূর্ব্বক অনুগৃহীত ও বাধিত করিবেন।

১। আয়ুর্ব্বেদীয় ধাত্রীবিদ্যা সংগ্রহ পুস্তকের ৪১ পৃষ্ঠাতে কবিরত্ন মহাশয়—"বস্তিমামাসতোঽষ্টমাৎ" এই বচনের অর্থ এই রূপ লিখিয়াছেন যে, গর্ভাবস্থায় অষ্টমমাসের পূর্ব্বে বস্তি প্রয়োগ (পিচকারী ব্যবহার) নিষিদ্ধ। কিন্তু ভিষগাচার্য্য ঐ অর্থে ভুল ধরিয়া লিখিয়াছেন যে, "বস্তিমামাসতোঽষ্টমাৎ" অর্থ—অষ্টমমাসের পূর্ব্বে নহে, অষ্টম মাস হইতে পরে বস্তি অর্থাৎ পিচকারী নিষিদ্ধ।

ভিষগাচার্য্যের লিখিত উপরোক্ত অর্থ যে নিতান্ত ভ্রান্তিপূর্ণ ও আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রার্থের সম্পূর্ণ বিপরীত, এবং গর্ভিণীর পক্ষে নিতান্ত অনিষ্টকারক, তাহা সর্ব্ব সাধারণের অবগতির নিমিত্ত মূল প্রমাণ বচনসহ প্রদর্শন করিতেছি। আয়ুর্ব্বেদের সুবিখ্যাত প্রাচীন গ্রন্থ সুশ্রুত সংহিতার শারীরস্থানের দশম অধ্যায়ে লিখিত আছে—"বিশেষতস্তু গর্ভিণী প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় মাসেষু মধুর শীতদ্রব প্রায় মাহারমুপসেবেত। বিশেষতস্তু তৃতীয়ে ষষ্টিকৌদনং পয়সা ভোজয়েৎ, চতুর্থে দধ্না, পঞ্চমে পয়সা, ষষ্ঠে সর্পিষা চেত্যেকে। চতুর্থে পয়োনবনীত সংসৃষ্টমাহারয়েজ্জাঙ্গল মাংস সহিত হৃদ্যমন্নং ভোজয়েৎ। পঞ্চমে ক্ষীর সর্পিঃ সংসৃষ্টম্। ষষ্ঠে শ্বদংষ্ট্রা সিদ্ধস্য সর্পিষো মাত্রাং পায়য়েদ্ যবাগূং বা। সপ্তমে সর্পিঃ পৃথক্ পর্ণ্যাদিসিদ্ধমেবমাপ্যায়তে গর্ভঃ। অষ্টমে বদরোদকেন বলাতিবলাশত পুষ্পাপলল পয়োদধিমস্তু তৈল লবণ মদনফল মধু ঘৃত মিশ্রেণ স্থাপয়েৎ পুরাণ পুরীষশুদ্ধ্যর্থমনুলোমনার্থঞ্চ বায়োঃ। ততঃ পয়োমধুর কষায়সিদ্ধেন তৈলে নানুবাসয়েদনুলোমে হি বায়ৌ সুখং প্রসূয়তে নিরুপদ্রবা চ ভবতি। অত ঊর্দ্ধং স্নিগ্ধাভির্যবাগূভির্জ্জাঙ্গল রসৈশ্চোপক্রমেদা-প্রসবকালাদেবমুপক্রান্তা স্নিগ্ধা বলবতী সুখমনুপদ্রবা প্রসূয়তে"। সুধী পাঠকগণ সুশ্রুত সংহিতার এই বচনের অর্থ পর্য্যালোচনা করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, আয়ুর্ব্বেদপারদর্শী সুশ্রুত সংহিতাকার গর্ভিণীকে অষ্টম মাস হইতেই পিচকারী ব্যবহারের ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং তাহার কারণ স্বরূপ লিখিয়াছেন যে, উহাদ্বারা গর্ভিণীর উদরস্থ বদ্ধমল নিঃসৃত হইয়া বায়ুর অনুলোমতা সাধন করিবে। তাহাতে যথা সময়ে নির্ব্বিঘ্নে সুপ্রসব হইবে এবং গর্ভিণীর কোনরূপ উপদ্রব উপস্থিত হইবে না।

উক্ত সুশ্রুত সংহিতায় গর্ভিণীর প্রথম মাস হইতে সপ্তম মাস পর্য্যন্ত যে যে প্রকার নিয়মাদি প্রতিপালন করিতে হইবে, তাহা বিধি-

থাকিতে পারি না, কারণ অনেক গ্রন্থেরই সমালোচনা অসঙ্গতি দোষে দুষ্ট দেখিতে পাই। আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থকারদিগকেও বলি,—তাঁহারাই বা পাত্রাপাত্রের বিচার না করিয়া যে সে স্থানে সমালোচনার জন্য পুস্তক প্রেরণ করেন কেন? যাহা হউক ধাত্রীবিদ্যার গ্রন্থকারের অন্যায় সমালোচনায় তাঁহার পুস্তকের মর্য্যাদা কমিবেনা, আমরা সে গ্রন্থ যে নির্ভুল তাহা বহু পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছি। আঃ সং

বদ্ধ হইয়াছে কিন্তু পিচকারী ব্যবহার করার বিষয় অষ্টম মাসের পূর্ব্বে কিছুই উল্লিখিত হয় নাই; সুতরাং প্রথম মাস হইতে সপ্তম মাস পর্য্যন্ত উহা নিষিদ্ধ।

গর্ভিণীর পিচকারী ব্যবহার বিষয়ে সুপ্রসিদ্ধ চরক সংহিতার শারীরস্থানের অষ্টম অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে যে—"নবমেতু খবেনাং মাসে মধুরৌষধ সিদ্ধেন তৈলেনানুবাসয়েৎ"। পাঠকগণ এই বচনে দেখিতে পাইবেন যে, অতি প্রাচীন চরক সংহিতাকারও গর্ভিণীর নবম মাসে পিচকারী ব্যবহারের বিধান করিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদবিশারদ বাগ্‌ভটাচার্য্যও অষ্টাঙ্গহৃদয় গ্রন্থের শারীরস্থানের প্রথম অধ্যায়ে গর্ভের অষ্টম ও নবম মাসে পিচকারী ব্যবহার করার অভিমতই ব্যক্ত করিয়াছেন।

যথা—"—অষ্টমে * * *
মধুরৈঃ সাধিতং শুদ্ধোপুরান শকৃত স্তথা
শুষ্কমূলক কোলাম্ল কষায়েণ প্রশস্ততে।
শতাহ্ব কল্কিতো বস্তিঃ স তৈল ঘৃত সৈন্ধবঃ।
* * শস্তশ্চ নবমে মাসি * *
পূর্ব্বোক্তং চানুবাসনং"।

ফল কথা, সুশ্রুত সংহিতা, চরকসংহিতা ও অষ্টাঙ্গ হৃদয় প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদীয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সমূহের প্রণেতাগণ কেহই গর্ভের অষ্টম মাসের পূর্ব্বে পিচকারী ব্যবহার করার বিধান করেন নাই।

এমতাবস্থায় সমালোচক ভিষগাচার্য্য পূর্ব্বোক্ত বচনের অষ্টম মাস হইতে পিচকারী ব্যবহার নিষিদ্ধ, এই অযথা অর্থ করিয়া পরের ভুল ধরিতে গিয়া নিজেই উপহাসাস্পদ হইয়াছেন। "আমাসতোঽষ্টমাৎ" এই স্থলে "আ" উপসর্গের অর্থ পূর্ব্ব, অর্থাৎ অষ্টমমাসের পূর্ব্বে পিচকারী ব্যবহার নিষিদ্ধ এই অর্থই প্রকৃত ও সুসঙ্গত।

২। ভিষগাচার্য্য উপরোক্ত পুস্তকের ৪৪পৃষ্ঠায় অসাময়িক গর্ভপাতের উপদ্রব লক্ষণে আনাহ শব্দের অর্থ যে উদরাধ্মান বলিয়া লিখিত হইয়াছে তাহাতে লিখিয়াছেন, যে, আনাহ উদরাধ্মান নহে, মলবদ্ধতা হইবে। আনাহ শব্দ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থের অধিকাংশস্থলেই আধ্মান অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে; কোন কোন স্থলে বন্ধনবৎ বা আকর্ষণবৎ বেদনা অর্থেও প্রযুক্ত হইয়াছে এবং আনাহ নামে স্বতন্ত্র একটী রোগও আছে। এইজন্য আনাহ শব্দের উদরাধ্মান অর্থই অধিক সুসঙ্গত, কারণ অসাময়িক গর্ভপাত হইলে প্রসূতির তাৎকালিক বায়ু বৃদ্ধি হেতু উদরাধ্মান হওয়াই সম্ভবপর।

মহামহোপাধ্যায় মাধবকরকৃত রোগ বিনিশ্চয় সংগ্রহগ্রন্থের, অলসক রোগের লক্ষণে লিখিত "কুক্ষিরানহ্যতেঽত্যর্থং" এই বচনের ব্যাখ্যাস্থলে টীকাকার আয়ুর্ব্বেদ বিশারদ বিজয় রক্ষিত লিখিয়াছেন "অনাহ্যতে আধ্মায়তে"। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ পণ্ডিত বিজয় রক্ষিতও আনাহ শব্দের অর্থ আধ্মান বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। রোগ বিনিশ্চয় সংগ্রহগ্রন্থে বাতব্যাধি—অধিকারে লিখিত "পক্বাশয়স্থোঽন্ত্রকূজং শূলাটোপৌ করোতি চ। কৃচ্ছ্র মূত্র পুরীষত্বদানাহং ত্রিকবেদনাম্॥" এবং গুল্ম রোগাধিকারে লিখিত—

"অরুচিঃ কৃচ্ছ্র বিণ্মূত্র-বাততাম্রবিকূজনন্।
আনাহশ্চোর্দ্ধবাতত্বং সর্ব্বগুল্মেষু লক্ষয়েৎ॥"

এই উভয় স্থলেই আনাহ শব্দের অর্থ উদরাধ্মান, কারণ উক্ত উভয় বচনেই মল মূত্রের কৃচ্ছ্রতা স্বতন্ত্র ভাবে উল্লিখিত আছে; সুতরাং কবিরত্ন মহাশয় উদরাধ্মান লিখিয়া কিছুই ভুল করেন নাই।

৩। উক্ত আয়ুর্ব্বেদীয় ধাত্রীবিদ্যা সংগ্রহ পুস্তকের ২৩ পৃষ্ঠায় গর্ভিণীর লক্ষণ বিবরণে—

"রোমরাজ্যাঃ প্রকাশনম্" এইবচনের অর্থ রোম সমূহের অধিক প্রকাশ বলিয়া লিখিত হইয়াছে। ভিষগাচার্য্য ইহাতে ভুল ধরিয়া লিখিয়াছেন যে, "রোমরাজী অর্থ রোমসমূহ নহে, নাভির নিম্নে যে রোমের রেখা আছে তাহাকে রোমরাজী বা রোমাবলি বলে।"

রোমরাজী শব্দের অর্থ যে নাভির নিম্নস্থ রোমের রেখা তাহা তিনি কোন্ প্রমাণ দৃষ্টে নির্দ্দেশ করিলেন তাহা কিছুই উল্লেখ করেন নাই, উহা যে গ্রন্থের বচন তাহার টীকাকার ও উহার অর্থ স্থলে তদ্রূপ কিছু লিখেন নাই, যদি সাধারণ প্রচলিত অর্থ ভিন্ন অন্য কোন অর্থে উহা প্রযুক্ত হইত তবে টিকা কর তাহা অবশ্যই লিখিতেন।

সুতরাং উহার সাধারণ প্রচলিত অর্থ রোমসমূহের অধিক প্রকাশ লিখাতে কোনই ভুল হয় নাই। তবে রোম সমূহের অধিক প্রকাশ যথাসম্ভব স্থানেই হইবে ইহা বলাই বাহুল্য।

৪। উক্ত গ্রন্থের ৪৫ পৃষ্ঠায়—গর্ভিণীর উদর মধ্যে ভ্রূণের মৃত্যু হইলে যে যে লক্ষণ উপস্থিত হয় প্রথমতঃ তৎসমস্ত লিখিয়া পরে সুশ্রুতোক্ত "ভবত্যুচ্ছ্বাস পুতিত্বং শূনতাস্তর্মৃতে শিশৌ"। এই বচনের অর্থ এইরূপ লিখিত হইয়াছে যে "অপিচ মৃত গর্ভারমণীর শরীরে শোথ ও নিশ্বাসে দুর্গন্ধি অনুভূত হইয়া থাকে"

উক্ত ভিষগাচার্য্য মহাশয় এইস্থলের অনুবাদে ভুল প্রদর্শনার্থ লিখিয়াছেন যে—"পেটের মধ্যে সন্তান মরিয়া গেলে গর্ভিণীর শরীরে শোথ হয় ইহা ভুল, মূল বচনে যে শূনতা আছে তাহার অর্থ উদরস্ফীতি এবং এই অর্থই স্বাভাবিক"। শূনতা শব্দের অর্থ যে উদরস্ফীতি ইহা ভিষগাচার্য্য মহাশয়ের স্বকপোল কল্পিত এক অভিনব অর্থ বটে। শূনতা শব্দের প্রকৃত অর্থ শোথ, আধ্মান শব্দের অর্থ উদর স্ফীতি হইতে পারে, তাহা উক্ত পুস্তকে মৃতগর্ভার প্রথমোক্ত অন্যান্য লক্ষণ মধ্যে শ্রীযুক্ত কবিরত্ন মহাশয়ই বাগ্‌ভটোক্ত "ধ্মাত" শব্দের অনুবাদে মৃতগর্ভারমণীর উদর স্ফীত হয় বলিয়া লিখিয়াছেন। মৃতগর্ভা-রমণীর উদর স্ফীত হওয়া সম্ভবপর বটে। কিন্তু শোথ উদরে এবং অন্যান্য অঙ্গেও হইতে পারে। মধ্যে মধ্যে দেখা ও যায় যে কোন কোন মৃতগর্ভা রমণীর উদরে, হাতে পায়ে ও মুখে শোথের সঞ্চার হইয়া থাকে।

সুতরাং এমতাবস্থায় কবিরত্ন মহাশয়ের কৃত নির্দ্দোষ অনুবাদে ভুল হইয়াছে বলিয়া লিখিয়া ভিষগাচার্য্য মহাশয় নিজের অজ্ঞতা ও ধৃষ্টতাই প্রকাশ করিয়াছেন।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অগাধ রত্নাকর সদৃশ দুরধিগম্য ও সাঙ্কেতিক, দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত উপযুক্ত সৎ-গুরুর নিকটে অবস্থিতি করিয়া যথাযথ ভাবে শিক্ষা ও অনুশীলন না করিলে উক্ত শাস্ত্রের মর্ম্ম পরিগ্রহ করা যায় না; কেবল ২।৪ খানা কাব্যগ্রন্থ কিম্বা ২।১ খানা দর্শন গ্রন্থ পাঠ করিয়া এবং আয়ুর্ব্বেদের ২।১ খানা সংগ্রহ

গ্রন্থ পাঠ করিয়াই "ভিষগাচার্য্য,, হওয়া যায় না।

প্রাচীন চরক স্থশ্রুত প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদীয় মূল সংহিতা গ্রন্থসমূহ যথানিয়মে সংগুরুর নিকটে অধ্যয়ন ও অনুশীলন না করিয়া যাঁহারা কেবল ২।১ খানা আয়ুর্ব্বেদের সংগ্রহ গ্রন্থ পাঠ করিয়াই মনে করেন যে, আয়ুর্ব্বেদ বিশারদ ভিষগাচার্য্য হইয়াছি—তাঁহারা নিতান্তই ভ্রান্ত।

সংস্কৃত ভাষায় সামান্য অধিকার আছে বলিয়া সেই গর্ব্বে আয়ুর্ব্বেদের মূল সংহিতা গ্রন্থ সমূহ পাঠ না করিয়াই এবং আয়ুর্ব্বেদাভিজ্ঞ সংগুরুর উপদেশ গ্রহণ না করিয়া যাঁহারা উক্ত গ্রন্থ সমূহ হইতে উদ্ধৃত প্রমাণ বচন সমূহের অর্থ ও ভাব সম্বন্ধে ভ্রমপূর্ণ মন্তব্য প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদিগের ধৃষ্টতা ও দুঃসাহস লক্ষ্য করিয়া সুধী-সমাজ বিস্মিত ও ব্যথিত হইবেন।

পরমায়ুপ্রসঙ্গ

বা

মানুষ মরে কেন।

পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর।

দৈব ও পুরুষাকারের কথা।

[কবিরাজ শ্রীঅক্ষয়কুমার বিদ্যাবিনোদ ধন্বন্তরি]

—:*:—

ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে, পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্মের নাম দৈব, আর ইহজন্মাচরিত কর্ম্মের নাম পুরুষকার।

দৈব ত্রিবিধ। উত্তম দৈব, মধ্যম দৈব, ও হীনদৈব। পুরুষকারও তিন প্রকার। উত্তম পুরুষকার, মধ্যম পুরুষকার ও হীন পুরুষকার।

অতঃপর আমাদিগকে জ্যোতিষ শাস্ত্রের সাহায্য লইয়া পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ দৈবের বিষয় বুঝাইতে হইবে। জ্যোতিষ শাস্ত্র কাহাকে বলে, তাহা সকলেই জানেন। জ্যোতিষ শাস্ত্র দুই প্রকার। গণিত জ্যোতিষ ও ফলিত জ্যোতিষ। যাহাদ্বারা গ্রহ নক্ষত্রাদির উদয়াস্ত, তিথি, বার, ও গ্রহণাদি জানিতে পারা যায়; তাহার নাম ~~ফলিত~~ গণিত জ্যোতিষ—এবং যাহার দ্বারা মনুষ্য জীবনের জন্মমৃত্যু, সুখ, দুঃখ, আয়, ব্যয় ও স্ত্রী পুত্রাদির শুভাশুভ অবগত হওয়া যায় তাহার নাম ফলিত। পঞ্জিকা সকলেই দেখিয়াছেন, উহার মধ্যে প্রতি মাসে এক একটী করিয়া চক্র থাকে

তাহাও সকলে দেখিয়াছেন, ঐ চক্রকে রাশি-চক্র বলে। উহার দ্বাদশটী ভাগ অর্থাৎ ঘর আছে। এক একটী ঘরকে মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট প্রভৃতি দ্বাদশ রাশির স্থান বলা যায়, কোন্ মাসে কোন্ কোন্ গ্রহ কোন্ রাশিতে অবস্থান করিতেছেন, তাহা পঞ্জিকাকারগণ প্রতি মাসেই পঞ্জিকা মধ্যে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কাহারও জন্মপত্রিকা (কোষ্ঠী) প্রস্তুত করিতে হইলে অগ্রে লগ্ননিরূপণ করিতে হয়। লগ্ন নিরূপণ করিতে হইলে, যে মাসে জন্ম সেই মাসে সূর্য্য কোন রাশিতে আছেন, কোন তারিখে ও কত বেলায় জন্ম, রবি মূর্ত্তি কত গিয়াছে, মেষাদি রাশির স্থিতিকালের সমষ্টিই বা কত, এই সমস্ত জানিবার নিমিত্ত জ্যোতিষ শাস্ত্রে অনেক কথা বর্ণিত আছে। এইস্থলে সে সকলের প্রমাণ উত্থাপন করা অসম্ভব। যাহা হউক জ্যোতিষশাস্ত্রোক্ত প্রক্রিয়া অনুসারে লগ্ন নিরূপিত হইলে, মেযাদি দ্বাদশ রাশির যে রাশিতে লগ্ন পড়িল, সেই রাশিকে লগ্ন অথবা প্রথম গৃহ বলা যায়। তার পর বামাবর্ত্তে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ প্রভৃতি আরও একাদশটী গৃহ থাকে। লগ্নে অর্থাৎ প্রথম গৃহে জাতকের তনুভাব, দ্বিতীয়ে ধন ভাব, তৃতীয়ে সহজভাব, চতুর্থাদিতে এমন বন্ধুভাব, পুত্রভাব, জায়াভাব, নিধনভাব, ধর্ম্ম-ভাব, কর্ম্মভাব, আয়ভাব, ব্যয়ভাব প্রভৃতি দ্বাদশ ভাবের বিচার করিতে হয়। প্রথম গৃহে অর্থাৎ তনুভাবে জাতকের আকৃতি প্রকৃতি, রূপ-গুণ, বর্ণ-তেজ, স্বাস্থ্য ও আয়ুর বিচার করা যায়। লগ্নস্থলে শুভগ্রহ থাকিলে শুভ ফল হয়, অশুভ গ্রহ থাকিলে অশুভ ফল হইয়া থাকে, তদ্ভিন্ন রব্যাদি গ্রহগণের বলাবল, তাঁহাদের তুঙ্গ বা সুতুঙ্গ স্থানেরও বিচার আবশ্যক। লগ্ন, চতুর্থ, সপ্তম ও দশম স্থানকে কেন্দ্র, এবং নবম ও পঞ্চম স্থানকে ত্রিকোণ কহে। তুঙ্গী, কেন্দ্রী এবং ত্রিকোণ-স্থিত শুভগ্রহ মহাশুভ ফল প্রদান করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত কোনও শুভগ্রহের দৃষ্টি পাইলেও গ্রহগণ বলীয়ান হয়েন।

তাহা হইলেই যদি কোনও ব্যক্তির লগ্নে অর্থাৎ আয়ুস্থানে শুভগ্রহ থাকেন এবং সেই গ্রহ যদি কেন্দ্র বা ত্রিকোণস্থিত কিংবা তুঙ্গ ভাবে অবস্থিত হয়েন, আর যদি তাঁহার উপর কোনও শুভগ্রহের দৃষ্টি থাকে তাহা হইলেই তাহার উত্তম দৈব হইল। এবম্ভূত ব্যক্তিই দীর্ঘায়ু লাভ করে, তাহাকে মারে কে? পুনশ্চ যদি কালেরও আয়ুস্থানে শুভগ্রহ আছেন বটে; কিন্তু সেই গ্রহ কেন্দ্র বা ত্রিকোণস্থিত নহেন; তাহা হইলে তাহার মধ্যম দৈব হইল। এবংবিধ ব্যক্তি মধ্যম আয়ুঃ লাভ করিতে পারে। আর যদি কাহারও আয়ুস্থানে অশুভ গ্রহ থাকেন, এবং তাঁহার উপর কোনও শুভগ্রহের দৃষ্টি না থাকে তাহা হইলেই সেই ব্যক্তির হীন দৈব হইল। এতাদৃশ ব্যক্তিই অল্পায়ুঃ হয়।

অতঃপর ত্রিবিধ পুরুষকারের কথা বলা যাইতেছে। ঐহিক কর্ম্মকে পুরুষকার বলে, তাহা ত পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। কর্ম্ম তিন প্রকার, নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য। পুত্রাদি ঐশ্বর্য্য এবং সুখ স্বাচ্ছন্দ্য প্রভৃতি কামনা করিয়া লোকে যে সকল শ্রৌত বা স্মার্ত্তকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে সেই সকলকে কাম্য কর্ম্ম বলে। যেমন দশ পৌর্ণমাস, জ্যোতি-ষ্টোম, দোল দুর্গোৎসব প্রভৃতি। অপিচ

কোনও শুভ কর্ম্মের উপলক্ষে যে সকল আনুসঙ্গিক অন্যান্য মাঙ্গল্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতে হয় তাহাদিগের নাম নৈমিত্তিক কর্ম্ম। যেমন পুত্রকন্যার সংস্কার নিমিত্তক নান্দীমুখ, অথবা তীর্থ প্রত্যাগমন বা প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি। আর সংসারী লোকের প্রতিদান করণীয় যে সকল কর্ম্ম তাহাদিগকে নিত্য কর্ম্ম বলে। যেমন পঞ্চমহাযজ্ঞ ভূত বলি সেবা, সন্ধ্যা আহ্নিক, স্নানাহার, নিদ্রা, প্রাতঃরুত্থান ও শৌচাদি।

পূর্ব্বোক্ত ঐহিক সকল যিনি যথাবিধানে সমাধা করিয়া থাকেন, তাঁহার উত্তম পুরুষকার হয়। যিনি আংশিক ভাবে সমাধা করেন, তাঁহার মধ্যম পুরুষকার এবং যিনি কিছুমাত্র সমাধা করেন না তাঁহার হীনপুরুষকার বলা যায়। ইহাতে পাঠকবর্গ বুঝিয়া লউন যাহার উত্তম দৈব এবং উত্তম পুরুষকার, সেই দীর্ঘায়ু; যাহার মধ্যম দৈব এবং মধ্যম পুরুষকার, সেই মধ্যায়ু; এবং যাহার হীন দৈব এবং হীন পুরুষকার, সেই ক্ষুদ্রায়ু হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত কথা গুলি আরও স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দেওয়া যাইতেছে। মনে করুন, কোনও ব্যক্তির কোষ্ঠীর মতে আয়ুস্থানে বলীয়ান শুভগ্রহ কেন্দ্র বা ত্রিকোণ স্থিত অথবা তুঙ্গভাবে অবস্থিত হইয়া কোনও শুভগ্রহের দৃষ্টি পাইতেছেন; আর সেই ব্যক্তিই যদি ইহজীবনে ব্রতপূজাদি সদনুষ্ঠানে নিরত, প্রাতরুত্থান, শৌচাদি, স্নানাহ্নিক, অতিথিসেবা প্রভৃতি বৈধকর্ম্মে মনোযোগী, যথাকালে হিতমিত ভোজনশীল; অখাদ্য-কুখাদ্য ও পাপকর্ম্ম বিরত এবং গুরুশুশ্রূষাদি কার্য্যে অবস্থিত হয়; তাহা হইলেই সেই ব্যক্তির উত্তম দৈব ও উত্তম পুরুষাকারের একত্র হইল, সুতরাং সেই বক্তি দীর্ঘায়ু হইবে অর্থাৎ আশী নব্বুই শত বা শতাধিক বৎসর বাঁচিয়া থাকিবে।

[ক্রমশঃ]

কলিকাতা "আয়ুর্ব্বেদ মেডিকেল কলেজে"র বার্ষিক পরীক্ষার ফল।

—:০:—

নিম্নলিখিত ছাত্রগণ ১ম হইতে ২য় বর্ষে উন্নীত হইল—গুণানুসারে।

(১ম বিভাগ)

১। শ্রীশশাঙ্কবিকাশ দাসগুপ্ত।
২। „ সতীশচন্দ্র মৈত্র।
৩। „ প্রতুলচন্দ্র দাশগুপ্ত।
৪। শ্রীউজীর চাঁদ।
৫। „ মনোমোহন চৌধুরী।
৬। „ বারিদবরণ চট্টোপাধ্যায়।

(২য় বিভাগ)

১। শ্রীরাসবিহারী আচার্য্য।
২। { ,, ভূপেন্দ্রনাথ গুপ্ত। , কানাইলাল সেনগুপ্ত। }
৩। শ্রীদক্ষিণারঞ্জন পাণ্ডা।
৪। ,, লক্ষণ হেগ্ডি।
৫। ,, রমেশচন্দ্র দত্ত।
৬। শ্রীনীরদবন্ধু ঘটক।

(৩য় বিভাগ).

১। ,, ধীরেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত।
২। ,, অশ্বিনী কুমার চক্রবর্ত্তী।
৩। { ,, রজনীকান্ত রায়। ,, সুধীরকুমার সেনগুপ্ত। }

নিম্নলিখিত ছাত্রগণ ২য় হইতে তৃতীয় বর্ষে উন্নীত হইল—গুণানুসারে।

(১ম বিভাগ)

১। শ্রীবিষ্ণুদাস প্রধান।
২। ,, ভবেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
৩। ,, নীরদচন্দ্র সেনগুপ্ত।
৪। ,, ইন্দুভূষণ সেনগুপ্ত।
৫। ,, মহাবলা শেঠী।
৬। ,, ক্ষীরোদমোহন রায়।
৭। ,, উপেন্দ্রকৃষ্ণ রায়।
৮। ধরণীধর সেন।
৯। ,, অশ্বিনীকুমার দেবনাথ।
১০। ,, যজ্ঞেশ্বর চক্রবর্ত্তী।
১১। ,, সুধাংশু ভূষণ মুখোপাধ্যায়।

(২য় বিভাগ)

১। { শ্রীনিরঞ্জন দাশগুপ্ত। শ্রীপতিচরণ মণ্ডল। }
২। ,, রাজেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত।
৩। ,, বৈদ্যনাথরায়।
৪। ,, অবনীভূষণ গুপ্ত।
৫। ,, গণনাথ শর্ম্মা।

(৩য় বিভাগ)

১। শ্রীশ্রীশচন্দ্র দাস।
২। ,, অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।
৩। ,, বি, এল, এফ, বিক্রমসূর্য্য
৪। ,, শম্ভুশিব আয়ার।
৫ ৬ † { শ্রীরমেশচন্দ্র পাল। ,, সুশীলপতি রায়। }

নিম্নলিখিত ছাত্রগণ ৩য় হইতে ৪র্থ বর্ষে উন্নীত হইল—গুণানুসারে।

(১ম বিভাগ)

১। শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায় চট্টোপাধ্যায়।
২। ,, নীলকণ্ঠ দাস আইচ।
৩। ,, প্রভাতকুমার চক্রবর্ত্তী।
৪। ,, শচীন্দ্রভূষণ দাশ গুপ্ত।

(২য় বিভাগ)

১। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বড়ুয়া।
২। টি, এম্, বি, কুরে।
৩। ডি, ডি, উভয় শেথর।

(৩য় বিভাগ)

১। শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত।

চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর টেষ্ট পরীক্ষা—গুণানুসারে।

(১ম বিভাগ)

১। শ্রীরাজসিংহ বুদ্ধদাস।
২। ডি, এল, ডব্লিউ বিমলাজীউ।
৩। ,, জিতেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত।
৪। ,, দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

(২য় বিভাগ)

১। শ্রীলালবিহারী টীকাদার।
২। ,, অশ্বিনীকুমার চৌধুরী।
৩। ,, তুলসীচরণ হালদার।
৪। ,, গোপালচন্দ্র গোপ।

† ষাণ্মাসিক পরীক্ষার নম্বর দেখিয়া।

সমালোচনা।

রসসাগর কবি কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী মহাশয়ের বাঙ্গালা সমস্যা পূরণ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষার পরীক্ষক কবিভূষণ শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন উদ্ভট সাগর বি-এ সংগৃহীত ও সম্পাদিত। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, মূল্য ২৲ টাকা। রসসাগর কবি কৃষ্ণকান্ত প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্বে কবিত্বশক্তিতে বাঙ্গালা দেশকে এক অপূর্ব্ব সুধা বিতরণ করিয়াছিলেন। সন ১১৯৮ সালে তাঁহার জন্ম এবং ১২৫১ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। যে সময় রসসাগরের আবির্ভাব কাল, সে সময় বঙ্গজননী অনেক গুলি কবি পুত্র অঙ্কে ধারণ করিয়া গর্ব্বসুখ অনুভব করিতেছিলেন। কবিসম্রাট ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, কবিকুলগৌরব দাশরথিরায়, গীতিকবিতায় অতুলনীয় নিধুবাবু, বৈষ্ণব কবি গৌবিন্দ অধিকারী সে সময় কাব্যসম্পদে বাঙ্গালীর গৌরব-পতাকা উড্ডীন করিতেছিলেন। ভারত চন্দ্র, রামপ্রসাদ তাহার বহু পূর্ব্বে অন্তর্দ্ধান করেন। "ভারতে"র আসর রাখিবার বা 'রামপ্রসাদে'র মত-সাধনায় সিদ্ধ হইবার মত তখন আর কেহ ছিলনা, কিন্তু তখনও বাঙ্গালা দেশ এখনকার মত এত গন্ডভরা না হইয়া কবিত্বপূর্ণই ছিল। দেশের রাজন্যবর্গ এবং ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ তখনকার দিনে কবিতালেখকদিগকে উৎসাহ দিতেন, আদর করিতেন, তাহার ফলে কবিদিগের কাব্যকুঞ্জে কবিতাকুসুম ফুটিয়া উঠিত। সে স্ফুটনে দিগন্ত সুরভিপূর্ণ হইত।

রসসাগর বা কবি কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ীও এমনিভাবে তাৎকালিক নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ গিরীশচন্দ্রের সাহায্য পাইয়াছিলেন। কেমন করিয়া কৃষ্ণকান্তের এই সাহায্যপ্রাপ্তি ঘটিয়াছিল, তাহা আমরা আলোচ্যগ্রন্থের সংগ্রহকার পূর্ণ বাবুর ভাষাতেই বলিতেছি:— "কৃষ্ণকান্ত, মহারাজ গিরীশচন্দ্রের রাজসংসারে যথাসময়ে রাজস্ব দিতে না পারায় মহারাজ তাঁহার জমী ক্রোক করিয়াছিলেন। যে জমী ক্রোক করা হইয়াছিল, সে জমী তৎকালে ধান্য পরিপূর্ণ হইয়া পরম শোভা পাইতেছিল। ধান্য গুলি শাঁস মুখে লইয়া ফুলিয়াছে, কিছু দিন পরেই পাকিয়া উঠিবে, এরূপ সময়েই মহারাজ গিরীশচন্দ্র বহু আদরের ও আশার বস্তু জমীটুকু ক্রোক করিয়া বসিলেন। কৃষ্ণকান্ত অনন্যোপায় হইয়া রাজার সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইয়া নিম্নলিখিত সংস্কৃত কবিতাটি পাঠ করিলেন—

"অচির প্রসবা লক্ষ্মীঃ কৃষ্ণ প্রাণাধিকা চ যা।
সাপুংবত্তাবমাপন্না ইঠাৎ কোরকতাং গতা॥"

মহারাজ গিরিশচন্দ্র কৃষ্ণকান্তের কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে মাসিক ত্রিশ টাকা বেতনে সভাপণ্ডিত নিযুক্ত করিলেন। ইহাই হইল কৃষ্ণকান্তের কবিত্ব-স্ফুটনের সূত্রপাত।

রসসাগরের কবিত্বশক্তি অতি অদ্ভুত ছিল। যে কোনো সমস্যা পাইলেই তিনি মুখে মুখে কবিতা রচনা করিয়া উহা পূরণ করিতে পারিতেন। এ ক্ষমতা রসসাগরের পর আর

কাহারও ভাগ্যে ঘটিলনা। নিম্নে তাঁহার সমস্যাপূরণের দু' একটি নমুনা উদ্ধৃত করিতেছি :—

একদা যুবরাজ শ্রীশচন্দ্রের একজন পরম আত্মীয় রসসাগরকে প্রশ্ন করিলেন, "বড় দুঃখে সুখ"। রসসাগর তৎক্ষণাৎ তাহা পূর্ণ করিলেন,

চক্রবাক চক্রবাকী একই পিঞ্জরে
নিশায় নিষাদ আনি রেখে দিল ঘরে।
চকা কয় চকী প্রিয়ে! এ বড় কৌতুক,
বিধি হ'তে ব্যাধ ভাল "বড় দুঃখে সুখ।"

একদিন রাজসভায় প্রশ্ন হইল—"বড়শী বিঁধিল যেন চাঁদে।" রসসাগর পূরণ করিলেন,—

একদিন শ্রীহরি মৃত্তিকা ভক্ষণ করি,
ধূলায় পড়িয়া বড় কাঁদে,
(রাণী) অঙ্গুলি হেলায়ে ধীরে মৃত্তিকা বাহির করে
"বড়শী বিঁধিল যেন চাঁদে॥"

একদা রাজসভায় প্রশ্ন হইল,—"বদর বদর"। রসসাগর অমনি পূরণ করিলেন,—

প্রকোষ্ঠ ভাঙ্গিলে হয় সকলি সদর,
টাকা কড়ি না থাকিলে না আছে কদর।
শাল দোশালা ঘুচে গেলে চাদরে আদর,
পাথারে পড়িলে তরি বদর বদর।'

একবার রসসাগর পীড়িত হইলে রাজবৈদ্য তাঁহাকে আরোগ্য করিয়াছিলেন। রসসাগর তজ্জন্য রাজবৈদ্যের ভূয়সী প্রশংশা করায় রাজ বৈদ্য বিনীত ভাবে কহিলেন,—"ঔষধং জাহ্নবী তোয়ং বৈদ্যো নারায়ণঃ স্বয়ম্।" রস সাগরও হাসিতে হাসিতে কহিলেন—"ঔষধি জাহ্নবীজল বৈদ্য নারায়ণ।" শুনিবামাত্র রাজ বৈদ্য কহিলেন, এখন আপনার সমস্যাটি আপনিই পূর্ণ করিয়া দিন। শুনিয়া রসসাগর উহা পূরণ করিলেন,—

এই দেহে বিদ্যমান ব্যাধি শত শত,
নয়টি ছিদ্রও তাহে রহে অবিরত।
কোন্ ছিদ্র দিয়া প্রাণ বাহিরিবে কবে,
কেহই বলিতে তাহা নাহি পারে ভবে।
হেন সার শূন্য দেহ নীরোগ রাখিতে
ইচ্ছা করে যদি কেহ এই পৃথিবীতে,
দুইটি উপায় তার রহে সর্ব্বক্ষণ,
ঔষধি জাহ্নবী জল, বৈদ্য নারায়ণ।'

এইরূপ এই গ্রন্থে ৩০৫টী সমস্যাপূরক কবিতা নিহিত হইয়াছে। তাঁহার বিস্তৃত জীবন চরিত এবং তাঁহার সম্বন্ধে নয়টি রসিকতার গল্পও এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। উদ্ভটসাগর পূর্ণ বাবু উদ্ভটশ্লোক গুলির উদ্ধারে যেরূপ বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন, এই গ্রন্থখানি প্রকাশের জন্যও তাঁহাকে তদপেক্ষা কম আয়াস স্বীকার করিতে হয় নাই। এই গ্রন্থসম্পাদনে বাঙ্গালীর প্রায় শত বর্ষের প্রাচীন কবিতার উদ্ধারে তাঁহার সে আয়াসস্বীকার সফলও হইয়াছে ইহা নিশ্চয়। এই গ্রন্থের ছাপা, কাগজ-বাইণ্ডিং সকলই পরিপাটি। পূর্ণবাবু এই গ্রন্থ-সম্পাদনে বাঙ্গালী মাত্রেরই ধন্যবাদের পাত্র। এই গ্রন্থ বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে রক্ষিত হউক। পূর্ণবাবু ভবিষ্যতে এইরূপ বাঙ্গালীর আরও লুপ্তরত্নোদ্ধারে কৃতকার্য্য হউন, ইহাই আমরা কামনা করিতেছি।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

খাঁটি কবিরাজ।—কলিকাতায় খ্যাতনামা চিকিৎসকদিগের মধ্যে সেকালের মত খাঁটি কবিরাজ রহিলেন মাত্র একজন। বাকী সকলেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যমতের পরিপোষক হইলেন। সংপ্রতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ খাঁটি কবিরাজ দিগের মধ্যে অনেকে শল্য চিকিৎসার শিক্ষালাভ ভিন্ন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা যে সম্পূর্ণ হয় না—ইহা উপলব্ধি করিতে পারায় সত্যসত্যই আয়ুর্ব্বেদের নষ্টগৌরব আবার ফিরিয়া আসিবে মনে হইতেছে। গোঁড়ামি করিয়া লাভ কি? শল্যচিকিৎসার মূল-সূত্র আয়ুর্ব্বেদীয় ঋষিবাক্য হইলেও উহার অনালোচনায় এখন যে পাশ্চাত্য চিকিৎসা আয়ুর্ব্বেদের অনেক উচ্চে স্থান পাইয়াছে—ইহা তো ধ্রুব সত্যকথা। গোঁড়ামিতে এই শাশ্বত সত্যের অপলাপ করা হয়। তবে যিনি খাঁটি কবিরাজ বলিয়া একাকী রহিলেন, সংযমশিক্ষায় তাঁহাকে পিতামহ ভীষ্ম বলা যাইতে পারে। আয়ুর্ব্বেদকে নূতন করিয়া গড়িবার জন্য কলিকাতায় এই যে হুলস্থুল হইতেছে, তিনি তাহার নিকট হইতে দূরে অবস্থান করিবার চিরন্তন সংকল্প পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। অনেকে তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি সে পতিত্বের পুষ্পমাল্যগ্রহণে ঘৃণা-কুটিল-তাচ্ছিল্যের ভাবে, আত্মমর্য্যাদাই অটুট রাখিয়াছেন। এইজন্য অনেকে তাঁহার বিজয় ঘোষণা করিয়া বলিতেছেন,—আয়ু-র্ব্বেদের রাজস্থান এখন ম্লেচ্ছভাবাপন্ন হয় নাই, মহাপুরুষ রাণাপ্রতাপ এখনও আয়ুর্ব্বেদের রাজপুতানায় বর্ত্তমান রহিয়াছেন।

আভ্যন্তরীণ রহস্য।—সত্য সত্য মুখে বলি এক, আর কার্য্যে দেখাই অন্যরূপ, ইহা কখনই সমীচীন নহে। সত্য কথা বলিতে গেলে অনেক কবিরাজ মুখে বায়ুপিত্তকফের দোহাই দিয়া পাণ্ডিত্য বিজড়িত উপদেশা-বলী প্রদান করিলেও পরিজনদিগের মধ্যে জ্বর বিকার বা ঐরূপ কোন অসুখে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পাশ্চাত্যচিকিৎসকদিগের শরণ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন। মহাত্মা গঙ্গাধরের যে কয়জন শেষ শিষ্য অন্তর্হিত হইয়া-ছেন, তাহার মধ্যে স্বর্গীয় দ্বারকানাথ ও যোগেন্দ্রচন্দ্রের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দ্বারকানাথ স্বীয় কৃতিত্বে বিশ্ববিখ্যাত হইয়া-ছিলেন। যোগেন্দ্রচন্দ্র বাতাক্রান্ত হওয়ায় যষ্টি অবলম্বন ভিন্ন চলিতে পারিতেন না, এইজন্য তাঁহার প্রতিপত্তি বিশ্ববিখ্যাত না হইলেও যাঁহারা তাঁহাকে জানিতেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহার পাণ্ডিত্যের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিতেন। সত্য কথা, যোগেন্দ্রচন্দ্রের মত সকল শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ঋষিকল্প চিকিৎসক বৈদ্য জাতির গৌরবস্তম্ভ ছিলেন। কিন্তু তিনিও প্রয়োজন স্থলে সময় সময়—ডাক্তারদিগের সহায়তা গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। দ্বারকানাথের সম্বন্ধেও একথা প্রযুজ্য হইতে পারে। সেকালের অন্যান্য

কবিরাজ মহাশয় দিগের অনেকের বাড়ীতেও যে কখন ডাক্তার প্রবেশ করে নাই, এমন কথাও জোর করিয়া বলা যায় না। এ অবস্থায় জনসাধারণের নিকট পাশ্চাত্য চিকিৎসকদিগের নিন্দা করা আমাদের পক্ষে কখনও শোভন হয় কি ?

চিকিৎসার উদ্দেশ্য।—স্বীকার করি, আমাদের দেশের লোকের ধাতু-প্রকৃতি অনুসারে আমাদের দেশীয় চিকিৎসা তাহাদের পক্ষে যেরূপ উপযোগী—বিদেশীয় চিকিৎসা কখনই সেরূপ নহে। বরং এই উপযোগিতার অন্যথাচরণে অধুনা দেশে নানাপ্রকার নূতন ব্যাধিরই আবির্ভাব হইয়াছে। ডাক্তারিশাস্ত্রে কুইনাইন ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র, কিন্তু কুইনাইনের অযথা ব্যবহারে এখন অনেকে যে অনেক নূতন রোগকে ডাকিয়া আনিতেছেন, পাকস্থলীর ক্রিয়া-বৈষম্য যে কুইনাইনের অযথা প্রয়োগের ফলসম্ভূত—একথা অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু সেবনের ঔষধে আমাদের অনেক সময় অনিষ্ট উপস্থিত হইলেও শল্যকর্ম্মে অনেকস্থলে যে ডাক্তারদিগের সাহায্য গ্রহণ না করিলে আমাদের এক মুহূর্ত্ত চলিতে পারে না—ইহাও কি স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইবে ? চিকিৎসার উদ্দেশ্য তো সাফল্য সাধন। শস্ত্রকর্ম্মে সাফল্য সাধন করিতে হইলে আমাদের অবহিত হইয়া সেই বিদ্যা অর্জ্জনের জন্য ডাক্তারদিগের সহায়তা লইতেই হইবে।

আমাদের ক্ষমতা।—তা' ছাড়া গোঁড়ামি করিবার ক্ষমতা আমাদের কতটুকু—তাহাও আমাদের বিবেচনা করা উচিত। প্রাণ খুলিয়া স্পষ্টকথা বলিলে অনেকে রাগ করিবেন, কিন্তু একথা কি সত্য নহে যে—সে কালের মত বায়ু পিত্ত কফের নির্ণয়ে নাড়ী দেখা আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ কবিরাজ এখন সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে অতি অল্পই বিদ্যমান। কলিকাতা সহরে দর্শনী বা ভিজিটের অসম্ভব আধিক্য তো এখন যথেষ্ট, কিন্তু গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা-প্রদানের পক্ষে কয়জন নাড়ীজ্ঞানী বৈদ্য পাওয়া যায় ? নাড়ী দেখিয়া বুকে শ্লেষ্মা বসিয়াছে কিনা, নিউমোনিয়া হইয়াছে কিনা—মৃত্যুকালের আর বড় বেশী বিলম্ব নাই—এ সকল কথা কয়জন বৈদ্য বলিতে পারেন ? ডাক্তারেরা থার্ম্মোমিটার প্রয়োগ করেন, ষ্টেথেস্কোপ ব্যবহার করেন, এগুলা অনেকে উৎকট বলিয়া প্রচার করিলেও যথার্থ কথা বলিতে হইলে সেগুলি যে এইরূপ নাড়ীজ্ঞানবিহীন চিকিৎসকদিগের পক্ষ সহায়ক তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন কি ? চিকিৎসার সফলতা লাভ করিতে হইলে যেরূপ ভাবেই হউক রোগ নির্ণয় করিতে হইবে। সুতরাং সেই রোগ নির্ণয়ের সুগম পন্থার যত প্রকারে ব্যবস্থা করা যাইতে পারে,তাহা করা কি কর্ত্তব্য নহে ? সেইজন্য আমাদের মতে ভেদবুদ্ধি বিস্মৃত হইয়া চিকিৎসার সাফল্যসাধনের জন্য ডাক্তারদিগের নিকট শিক্ষণীয় বিষয়গুলির শিক্ষালাভ পূর্ব্বক চিকিৎসার উৎকর্ষ সাধন করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা এই কর্ত্তব্য পালন করিবেন, চিকিৎসাগৌরবে তাঁহারাই যে যশোরাশি অর্জ্জনের অধিকারী হইবেন,—ইহা যথার্থ—অবিসম্বাদিত সত্য, ইহার প্রতিকূলে কিছুই বলিবার নাই।

কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দাশ গুপ্ত কাব্যতীর্থ কর্ত্তৃক গোবর্দ্ধন প্রেস হইতে মুদ্রিত
ও ২৯নং ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট হইতে মুদ্রাকর কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৫ম বর্ষ। | বঙ্গাব্দ ১৩২৮—শ্রাবণ। | ১১শ সংখ্যা।

আয়ুর্ব্বেদ

আয়ুর্ব্বেদ ও আধুনিক রসায়ন নামক প্রবন্ধের প্রতিবাদ।

(কবিরাজ শ্রীশীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন)।

—:*:—

সুপ্রসিদ্ধ প্রবাসী পত্রিকায় 'আয়ুর্ব্বেদ ও আধুনিক রসায়ন' নামক একটী প্রবন্ধের কিয়দংশ দুই বার প্রকাশিত হইয়াছিল, প্রবন্ধটি উপাদেয় হইলেও অনেক বিষয়ে আমাদের মতানৈক্য আছে, সেই জন্য আমাকে এই প্রবন্ধে তাহারই প্রতিবাদ লিখিতে হইবে।

প্রবন্ধ লেখক রাজসাহী কলেজের শ্রীযুত পঞ্চানন নিয়োগী মহাশয় আধুনিক রসায়ন শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, কৃতশ্রম এবং উপযুক্ত সহায় সম্পন্ন। তিনি লিখিয়াছেন,—"আয়ুর্ব্বেদের প্রত্যেক অংশ ?) আধুনিক উন্নত বৈজ্ঞানিক সত্যের অনুযায়ী আমূল সংস্কার করিতে হইবে। সেই সংস্কারের মধ্যে ঔষধ-প্রস্তুতি-প্রণালীর সংস্কার অন্যতম। অতি প্রাচীন বহুব্যয়সাধ্য উপায় ত্যাগ করিয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায় সকল গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা হইলে আয়ুর্ব্বেদের প্রত্যেক ঔষধ (?) স্বল্পব্যয়সাধ্য হইয়া ভারতের অসংখ্য দরিদ্রের 'আশীর্ব্বাদের সামগ্রী হইবে।" বেশ কথা। যদি সকল দিক্ বজায় থাকে, আধুনিক উপায়ে প্রস্তুত ঔষধ বা ঔষধের উপাদান, আয়ুর্ব্বেদোক্ত উপায়ে প্রস্তুত ভৈষজ্যের ন্যায় কার্য্যকর হয় অর্থাৎ তাহাদের রস, গুণ, বীর্য্য, বিপাক এবং শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে, পরন্তু তাহাদের গুণ সম্বর্দ্ধিত হয়; তাহা হইলে ঔষধ প্রস্তুতি বিষয়ে আধুনিক বিজ্ঞানানুমোদিত উপায় অবলম্বন করাই প্রশস্তকল্প। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেরই এ

বিষয়ের মতদ্বৈধের সম্ভাবনা নাই। ঔষধ সকল অনায়াসে সুন্দররূপে প্রস্তুত হইবে, সুতরাং বিলক্ষণ সুফল প্রদান করিবে এবং অল্প পণে বিক্রয় করা যাইবে ইহা অপেক্ষা ঈপ্সিত বিষয় কি হইতে পারে? কিন্তু সকল দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কথা বলা এবং কাজ করাই সুসঙ্গত। নিয়োগী মহাশয় আধুনিক রসায়ন বিজ্ঞানকৌশলে লৌহ প্রভৃতি ধাতুভস্ম করিয়া এবং খনিজ ও ঔদ্ভিজ্জ নানাবিধ দ্রব্য শোধন করিয়া, তত্তৎ উপাদানযোগে আয়ুর্ব্বেদোপবিষ্ট ঔষধ কল্পনা করতঃ রোগীর শরীরে প্রয়োগ করিয়া সুফল লাভ করিয়াছেন কি না সে সংবাদ আমরা অবগত নহি। যদি তিনি সে সুযোগ পাইয়া আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধ-প্রস্তুতি প্রণালীর সংস্কারের জন্য উদ্যোগী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার উদ্যোগ সর্ব্বথা প্রশংসনীয় এবং উপদেশ বৈদ্যকমতাবলম্বি-চিকিৎসকগণের পক্ষে বিশেষ মঙ্গলকর। অন্ততঃ পক্ষে ইদানীন্তন প্রণালী অনুসারে ভস্ম করা এবং শোধন করা ধাতু, উপধাতু, মিশ্রধাতু এবং নানাপ্রকার খনিজ পদার্থ যোগে ঔষধ প্রস্তুত করিয়া ফলাফল পরীক্ষা করা উচিত।

বহু পূর্ব্বে আমি নিয়োগী মহাশয়ের প্রস্তাবিত বিষয়ে মনঃসংযোগ করিয়াছিলাম। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে এক জন চিকিৎসকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়, তিনি বৃন্দাবনের অধিবাসী, নাম কিষণলাল। কিষণলাল বরিশাল জেলার অন্তর্গত নলছিটী নামক প্রসিদ্ধ বন্দরে থাকিয়া বৈদ্যক এবং অবধৌতিক মতে চিকিৎসা করিতেন। শ্রীযুত পঞ্চানন নিয়োগী মহাশয় যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া হিরাকস হইতে লৌহ ভস্ম প্রস্তুত করিবার উপদেশ দিয়াছেন, উক্ত চিকিৎসকের নিকট হইতে আমি সেই প্রণালীতে লৌহভস্ম প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছিলাম এবং তুঁতিয়া হইতে তাম্র ভস্ম প্রস্তুত করিবারও প্রণালী অভ্যাস করিয়াছিলাম। ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া হিরাকস-সম্ভূত লৌহ ভস্ম এবং তুঁতিয়াসম্ভূত তাম্র ভস্ম যোগে কয়েক প্রকার ঔষধ কল্পনা করতঃ রোগি-শরীরে প্রয়োগ করিয়া ফলাফল পরীক্ষা করি। ফল সন্তোষজনক হয় নাই। প্রথমতঃ উক্ত প্রকার লৌহ যোগে 'নবায়স লৌহ' তৈয়ার করা হয়। একটী বার বছরের মেয়ের মুখমণ্ডলে বিশেষতঃ অক্ষিকূটে শোথ প্রকাশ পাইয়াছিল, পায়ের পাতায়ও মধ্যে মধ্যে শোথ দেখা দিত এবং হৃৎপিণ্ডের গতি কিছু দ্রুত হইয়াছিল। তাহাকে উক্ত ঔষধ সেবন করিতে দেওয়া হয়। বৈদ্যকমতাবলম্বি-চিকিৎসক মাত্রেই জানেন যে, উক্ত লক্ষণবিশিষ্ট রোগে নবায়স লৌহ অমোঘ ঔষধ। কিন্তু তিন সপ্তাহ কাল ব্যবহার করিয়াও বালিকার রোগোপশম হয় নাই। তার পর 'অতি প্রাচীন' প্রথায় প্রস্তুত লৌহ ভস্মযোগে নবায়স লৌহ প্রস্তুত করা হয়। দুই সপ্তাহেই রোগিণী আরোগ্য লাভ করে।

আমি 'চিত্রভানু' নামে একটী ঔষধ, যকৃৎ রোগের সর্ব্বাবস্থায় প্রয়োগ করিয়া থাকি। যকৃৎ বাড়িলে, যকৃৎ স্ফীত-লোহিত-বেদনাযুক্ত হইলে, যকৃৎ জন্য চোক মুখ ও মলমূত্রাদি হলুদবর্ণ হইলে এবং যকৃৎ ক্ষয়ের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে বা কঠিন হইলে উক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিয়া বিলক্ষণ সুফল পাওয়া যায়। উহার ন্যায় সর্ব্বপ্রকার যকৃদ্বিকারের শ্রেষ্ঠ ঔষধ আর

নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাম্রভস্ম—চিত্রভানুর অন্যতম উপাদান। কিন্তু তুঁতিয়া হইতে আকৃষ্ট তাম্রযোগে প্রস্তুত করিয়া কোন সুফল পাওয়া যায় না, বরং রোগী ঔষধ ভক্ষণের পর বহু ক্ষণ যাবৎ বিবমিষু হইয়া কষ্ট পায়। 'অতি প্রাচীন প্রথা' অনুসারে প্রস্তুত তাম্র ভস্ম যোগে চিত্রভানু প্রস্তুত করিলে সুফল পাওয়া যায়, বিবমিষাও উপস্থিত হয় না।

তথাপি নিয়োগী মহাশয়ের উপদেশ অনুসরণ করিয়া আয়ুর্ব্বেদের ঔষধ-স্কন্ধের প্রতিসংস্কার করিবার প্রয়াস পাওয়া উচিত। তিনি দেশহিতৈষী, দেশবৈরী নহেন। আয়ুর্ব্বেদের 'প্রতিসংস্কার করিতে হইবে' এরূপ মধুর কথা আমরা আজি পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য বিদ্যায় পারদর্শী কোন ব্যক্তির মুখেই শুনি নাই। তবে নিয়োগী মহাশয়ের উক্তির প্রতিবাদে আমাদের কিছু বলিবার আছে—একে একে সেই কথাগুলি বলিল।

নিয়োগী মহাশয় শ্রমস্বীকার করিয়া কবিরাজদিগের প্রস্তুত লৌহভস্ম পরীক্ষা করিয়া উপাদান বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। কিন্তু তিনি পরীক্ষার্থ ভাল লৌহভস্ম সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। পরম যত্নে অতি সাবধানে যে লৌহভস্ম করা হয়, তাহাতে বালুকাময় পদার্থ প্রভৃতি অপপদার্থের মিশ্রণ থাকে না। পরীক্ষক পরীক্ষার্থ যে সকল লৌহভস্ম সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ জারণ মারণ সময়ে সেই সকল লৌহ শিলাতলে পেষণ করা হইয়াছিল। লৌহ শিলাতলে, শিলাপুত্র অর্থাৎ নোড়া দিয়া পেষণ করিলে শিল নোড়া ক্ষয়িত হইয়া লৌহের সহিত মিশিয়া তাহার অবয়ব বৃদ্ধি করে। তাদৃশ মিশ্রণ অপনয়ন করা কঠিন। অপনয়নের চেষ্টাও কেহ করেন নাই। পুটিত লৌহ অমৃতীকরণের পূর্ব্বে পুনঃ পুনঃ ধুইয়া লইবার রীতি আছে, পরীক্ষার্থ গৃহীত লৌহ সম্ভবতঃ তাহাও করা হয় নাই। তজ্জন্য পরীক্ষা কালে পরীক্ষক জলে দ্রবণীয় পদার্থ-শত করা ৪·১ পাইয়াছেন। ঐ সকল দোষ বিবর্জ্জিত হইলে বৈদ্যক মতে লৌহভস্ম আর ফেরিক অক্সাইডে বিশেষ পার্থক্য থাকে না। যে পার্থক্য থাকে তাহা পরে বুঝান যাইবে।

এখন কথা হইতেছে যে, আয়ুর্ব্বেদ প্রদর্শিত নিয়মানুসারে এবং আধুনিক উন্নত রসায়ন শাস্ত্রানুমোদিত কৌশলে ভস্ম করা লৌহ যদি ঠিক একইরূপ দ্রব্য হইত, তাহা হইলে প্রথমোক্ত বহু ব্যয় ও আয়াসসাধ্য লৌহভস্মের পরিবর্ত্তে, অনায়াসে এবং অকিঞ্চিৎকর ব্যয়ে প্রস্তুত লৌহ ভস্ম গ্রহণ করিতে কোন আপত্তিই ছিল না। তাহাদের মধ্যে প্রভাবগত পার্থক্য আছে। তাহারই কথা বলিতেছি।

সম্ভবতঃ সকলেই শুনিয়াছেন যে, ঔষধের জীবন্যাস করিতে হয়। না করিলে ঔষধ সম্যক্ গুণ বীর্য্য-প্রভাব বিশিষ্ট হয় না। কিন্তু জীবন্যাসের প্রকৃত তাৎপর্য্য সকলের জানা না থাকিতে পারে। আধুনিক বৈদ্যদিগের মধ্যে কেহ কেহ মন্ত্র বিশেষ পড়িয়াই ঔষধের জীবন্যাস করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। জীবন্যাসের অর্থ অন্যরূপ। কথাটা পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি। কারণ জীবন্যাস কি তাহা না বুঝিলে উভয় প্রকারের জারা লৌহের পার্থক্য বুঝা যাইবে না।

জড় শরীরের আর প্রাণিদেহের উপাদান

ঠিক একরূপ নহে। জীবদেহের প্রত্যেক উপাদানের জীবনীশক্তি সুব্যক্ত, উদ্ভিজ্জ শরীরের উপাদানে সে শক্তি ঈষৎ ব্যক্ত এবং জড়দেহের অবয়বে তাহা অত্যন্ত অব্যক্তভাবে অবস্থিতি করে। অথচ আমাদিগকে ঈষদ্ ব্যক্ত বা অব্যক্ত জীবনীশক্তিক উদ্ভিজ্জ এবং জড়পদার্থ আহার করিয়া সুব্যক্ত জীবনী-শক্তিক প্রাণিশরীর গঠনোপযোগী উপাদানের সংস্থান করিতে হয়। যে যাহার সমান সেই তাহাকে পোষণ ও বর্দ্ধন করিতে পারে। যখন জীবদেহের আর উদ্ভিদ্ ও জড়দেহের উপাদান ঠিক একই রূপ নহে তখন জড় ও উদ্ভিদ্ ভক্ষণ করিয়া কিরূপ নিয়মে জীবদেহের তুষ্টি, পুষ্টি এবং সুস্থিতি ঘটিয়া থাকে? অসমান বা বিশেষ পদার্থ দ্বারা কিরূপে জৈবী তন্তকী (Animal tissues) সুস্থিত ও পুষ্ট হয়?

আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি যে, ভক্ষ্যদ্রব্য পরিপাকযন্ত্রের সাহায্যে সুপক্ক হইলে উহার জীবন্যাস ঘটে সুতরাং জীবশরীর পোষণকার্য্যে সমর্থ হয়। চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য এবং পেয় এই চতুর্ব্বিধ আহার পরিপাকান্তে মল বিমুক্ত হইয়া যে রস ধাতুতে পরিণত হয়, তাহা জীবন্যস্ত (Vitalised) উপাদান। সুতরাং জীবশরীরের গঠন ও পোষণের সম্যক্ উপযোগী। কিন্তু দ্রব্যমাত্রকেই জৈব পদার্থের সমধর্ম্মী করিয়া লইবার শক্তি আমাদের পরিপাকযন্ত্রের নাই। যে সকল দ্রব্য পরিপাক শক্তির সাহায্যে জীব-শরীরের উপাদানের সমান ধর্ম্মী না হয়, প্রক্রিয়া-বিশেষে তাহাদের জীবন্যাস করিয়া, ধাতুসাম্যের জন্য অথবা ধাতু বৈষম্য দূর করিবার নিমিত্ত, আহার্য্য এবং ঔষধরূপে কল্পনা করিতে হয়। অর্থাৎ সংস্কার, জারণ, মারণ এবং মর্দ্দন প্রভৃতি কর্ম্ম দ্বারা তদুপযোগী করিয়া লইতে হয়।

আধুনিক বিজ্ঞানানুমোদিত কৌশলে অতি সহজে লৌহ ধাতু ভস্মীভূত হইয়া অন্তর্ব্বাহ ক্রিয়ার উপযোগী হয় বটে, কিন্তু তথাবিধ লৌহের জীবন্যাস হয় না; সে কাজ পরিপাক শক্তির সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে। পরিপাক শক্তি বলবতী থাকিলে তাহার সাহায্যে সে লৌহ আদৌ সুপক্ক হইয়া তাহার মলভাগ এবং কষায়তা ত্যাগ করে, তারপর জীবধর্ম্মিতা প্রাপ্ত হয়। অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে, টিংচার ষ্টীল্ এবং কার্ব্বনেট অব্ আয়রন্ এবং হীরাকস হইতে যে লৌহ প্রস্তুত হয়, তাহা কষায়রস বিশিষ্ট, সুতরাং তত্তৎ লৌহ সেবন করিলে মল কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং কোষ্ঠকাঠিন্য ঘটে। পরিপাক শক্তি দুর্ব্বল থাকিলে উক্ত লৌহ সম্যক্ কার্য্যকর হয় না, পরন্তু পাকযন্ত্রের বিকার বিশেষ সংঘটন করে। তজ্জন্য দুর্ব্বল কোষ্ঠে লৌহ এবং অপরাপর ধাতু ঘটিত ঔষধ প্রয়োগ করিতে ডাক্তারেরা ইতস্ততঃ করেন। কবিরাজদিগকে সেরূপ ইতস্ততঃ করিতে হয় না। তাঁহারা গ্রহণী প্রভৃতি পুরাতন উদরাময় রোগে যখন পরিপাক শক্তি অবসন্ন হয়, তখন লৌহপর্প টী, পঞ্চামৃত পর্প টী এবং বিজয় পর্প টী প্রভৃতি লৌহ ও অন্যান্য ধাতুঘটিত ঔষধ নিঃশঙ্ক-ভাবে প্রয়োগ করিয়া থাকেন। প্রয়োগে যে অত্যাশ্চর্য্য সুফল লাভ হয়, সম্ভবতঃ তাহা অনেকেরই জানা আছে। ইহার কারণ এই যে, কবিরাজী ঔষধগত ধাতব উপাদান পরিপাক শক্তির অপেক্ষা না করিয়া, অন্তর্ব্বাহ নিয়মানুসারে নাড়ীর অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র পথ দিয়া সঞ্চরণ করতঃ রক্তগত হইয়া আপন গুণ-বীর্য্য-

প্রভাব প্রকাশ করে। বলা বাহুল্য যে বৈদ্যকমতে জারা লৌহ জীবন্যস্ত এবং বিবিধ গুণ-প্রভাব বিশিষ্ট পদার্থ।

তথাবিধ গুণবৎ লৌহযোগে কবিরাজ মহাশয়েরা বিবিধ প্রকার ঔষধ কল্পনা করিয়া নানা রোগে প্রয়োগ করিয়া থাকেন। শোনিকা (Red corpuscles) ক্ষয়ে রক্তহীনতা (Animia) উপস্থিত হইলে ডাক্তারদিগকে লৌহ বা লৌহঘটিত যোগ প্রয়োগ করিতে সচরাচর দেখা যায়; অন্যান্য স্থলে তাঁহারা কদাচিৎ লৌহ ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু বৈদ্যক-চিকিৎসা শাস্ত্রে নবজ্বর প্রভৃতি কয়েকটী স্থল ভিন্ন প্রায় সমস্ত রোগেই লৌহ ঘটিত ঔষধ প্রয়োগ করিবার উপদেশ আছে। কারণ বহু পুটে লৌহ ভস্ম করিলে, তাহাতে অচিন্ত্য-শক্তি বা প্রভাবের সঞ্চার হয়। তথাবিধ প্রভাববিশিষ্ট লৌহ বহুগুণ সম্পন্ন, সুতরাং নানা প্রকার রোগ প্রশমন করিতে সমর্থ। আধুনিক প্রণালীতে ভস্ম করা লৌহ এবং অন্যান্য ধাতুতে তথাবিধ প্রভাবের সঞ্চার হয় কি না, তাহা বিশেষরূপে পরীক্ষা না করিয়া আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুতি-কার্য্যে সে লৌহ প্রভৃতি ব্যবহার করা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

আমরা পুনঃ পুনঃ প্রভাবের কথা বলিতেছি; প্রভাব কাহাকে বলে তাহা বলা হয় নাই। কথাটা পরিষ্কার করিয়া বলা আবশ্যক, নহিলে বৈদ্যকমতে জারা লৌহ প্রভৃতির বিশিষ্টতা বুঝা যাইবে না।

রসে, গুণে এবং বীর্য্যে যদি দু'টী দ্রব্য একইরূপ হয়, বিশ্লেষণ করিলে উভয় দ্রব্যে তুল্য পরিমিত সমান উপাদান পাওয়া যায়, অথচ দ্রব্য দ্বয়ের কোনটীর কার্য্যগত বিশিষ্টতা থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, সেই বিশিষ্ট কার্য্য সেই দ্রব্যের প্রভাব বশতঃ ঘটিতেছে। দন্তীর শিকড় আর রক্তচিতার শিকড় এই উভয় দ্রব্যের রস-গুণ-বীর্য্য-বিপাকগত কোন পার্থক্য নাই। উপাদান বিশ্লেষণ করিলে সম্ভবতঃ উভয়ে একইরূপ উপাদান পাওয়া যাইতে পারে। অথচ দন্তীর-মূল বিরেচক, চিতার মূল ধারক। উপাদান গত পার্থক্য না থাকিলেও যে শক্তি অনুসারে চিত্রক ধারক এবং দন্তী বিরেচক তাহা অচিন্ত্য। সেইরূপ অচিন্ত্যশক্তির নাম প্রভাব। স্বভাবতঃ কোন দ্রব্যে প্রভাব-বিশেষের সঞ্চার হয়, প্রক্রিয়া বিশেষেও দ্রব্যে দ্রব্যে প্রভাব বিশেষের আবির্ভাব হইতে পারে। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি।

এক সময়ে একটী বয়স্ক ভদ্রলোক উদক-মেহ রোগে আক্রান্ত হন। প্রতিদিন পনের ষোল বার বহুপরিমিত স্বচ্ছ মূত্র ত্যাগ করিতেন। সম্ভবতঃ অনেকেরই জানা আছে যে, 'সোমনাথ রস' উক্ত প্রকার রোগের মহৌষধ। তাঁহাকে সোমনাথ রসেরই ব্যবস্থা করা হয়। হিঙ্গুলাকৃষ্ট পারা সেই ঔষধের অন্যতম উপাদান। হিঙ্গুলোথ পারা প্রথমে পালিধা মাদারের পাতার রসের সহিত বহুক্ষণ মাড়িয়া জলে পুনঃ পুনঃ ধুইয়া রসের সম্পর্ক শূন্য করতঃ রৌদ্রে শুকাইয়া লইতে হয়। তার পর গন্ধক যোগে কজ্জলী করিয়া, লৌহ প্রভৃতি উপাদান যোগে যথা বিধানে ঔষধ তৈয়ার করিতে হয়। উক্ত রোগীর জন্য যে সময়ে সোমনাথ রস প্রস্তুত করা হয়, তখন পালিধা মাদারের গাছে পাতা ছিল না, আমি ঔষধ নির্ম্মাণে

ইতস্ততঃ করিতেছিলাম। আমার একজন ডাক্তার বন্ধু বলেন যে, ঐরূপ প্রক্রিয়ায় পারার কিছু আসিবে না, এবং পারার কিছুই যাইবে না। হিঙ্গুলোত্থ রস যোগে ঔষধ তৈয়ার করিলেই হইবে। আমি তাঁহার বাক্যানুসারে তাই করিয়াছিলাম। এক মাস কাল সেই ঔষধ সেবন করিয়াও রোগী কিছুমাত্র সুফল পান নাই। ঔষধ তৈয়ারের ঐ ব্যতিক্রম টুকু আমার মনে জাগরুক ছিল। গাছে পাতা হইলে যথোপদিষ্ট নিয়মে সেই ঔষধ পুনর্ব্বার তৈয়ার করিয়া তাঁহাকে দেওয়া হয়। তিন দিন কাল সেবনের পর হইতে প্রস্রাব কমিতে থাকে, এক মাসেই আরোগ্য লাভ করেন। উক্ত প্রক্রিয়ার দ্বারায় যে প্রভাবের উদয় হয় তাহা অচিন্ত্য। বর্ত্তমান বিজ্ঞানানুসারে তাহা নির্ণয় করিবার সময় উপস্থিত হয় নাই।

সকলেই জানেন যে, সোণায়, পারায় আর গন্ধকে মিশাইয়া প্রক্রিয়া-বিশেষে মকরধ্বজ প্রস্তুত করিতে হয়। সোণা স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়া থাকে, গন্ধক যোগে পারদ লোহিত ভস্মে পরিণত হয়। স্বর্ণ ধাতু মকরধ্বজে মিশেনা বটে, কিন্তু স্বর্ণ যোগে মকরধ্বজে অপূর্ব্ব শক্তির সঞ্চার হয়, সেই শক্তির নাম প্রভাব। এই প্রভাবের কথা আজিও যাঁহারা বুঝেন নাই, তাঁহারা বলেন যে, সোণা দিয়া প্রস্তুত করিলে যাহা হয়, না দিয়া তৈয়ার করিলেও তাহাই হয়। কিন্তু তাহা কখনই হয় না, পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করিয়া আমরা তাহা বুঝিয়াছি। এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। এ সকল বিষয় উত্তমরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া কর্ত্তব্য অবধারণ করা উচিত।

তা'র পর নিয়োগী মহাশয় বলিতেছেন যে, আধুনিক উন্নত বিজ্ঞানানুমোদিত উপায়ে আয়ুর্ব্বেদের প্রত্যেক অংশের উন্নতি করিতে হইবে। সম্ভবতঃ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তাহার মর্ম্মগ্রহণ করিবার অবকাশ তাঁহার হয় নাই। তজ্জন্য বিশেষ বিবেচনা না করিয়া কথাটা বলিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহার বিবেচনা করা উচিত যে, জড়বাদশাস্ত্র দ্বারা আধ্যাত্মবাদ শাস্ত্রের প্রতিসংস্কার বা উন্নতি সাধন সম্ভবপর নহে। সে কথা পরে বিস্তার করিয়া বলিতেছি।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের মত এই যে, পুরুষ বা আত্মা, পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত এবং ইহ জন্মে অনুষ্ঠিত শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে সুখ-দুঃখ ভোগ করে। সেই ইন্দ্রিয় শরীর পুরুষের ভোগায়তন মাত্র। পুরুষের যদি পূর্ব্বজন্মকৃত সুকৃতি থাকে, তাহা হইলে, অব্যাপন্ন দেহে আবদ্ধ হইয়া পুনরপি ইহলোকে অবতীর্ণ হয়। শুভ প্রাক্তন পুরুষ ইহকালে সদ্‌বৃত্ত পরায়ণ হইলে তাহার ভোগা-য়তন দেহও সুস্থ থাকে। পরন্তু পুরুষ ধী-ধৃতি-স্মৃতি-বিভ্রষ্ট হইয়া অশুভ কর্ম্মপরায়ণ হইলে তাহার প্রজ্ঞাপরাধ উপস্থিত হয়। সেই প্রজ্ঞাপরাধ বা অধর্ম্ম কালক্রমে বিপরিণত হইয়া রোগরূপে দেহে বা মনে অথবা উভয় ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়।

কি উপায়ে মন্দ প্রাক্তনের খণ্ডন হয়, কিরূপ আহারাচার প্রভৃতি অনুষ্ঠান করিলে সত্ত্ব, আত্মা এবং শরীরের পবিত্রতা রক্ষা পায় এবং কি উপায়েই বা পরকালের উপায় হয় এই সকল এবং এতদনুরূপ অন্যান্য বিষয়, ভূয়িষ্ট পরিমাণে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে আলোচিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ অধুনাতন উন্নত চিকিৎসা-

বিজ্ঞান এবং রসায়ন প্রভৃতি বিজ্ঞানানুসারে আয়ুর্ব্বেদের এরূপ অংশের উন্নতির সম্ভাবনা নাই। নিয়োগী মহাশয় বলিয়াছেন যে, আয়ুর্ব্বেদের প্রত্যেক অংশের উন্নতি সাধন করিতে হইবে। বিশেষ বিবেচনা না করিয়াই কথাটী বলা হইয়াছে। তবে আয়ুর্ব্বেদের কোন্ কোন্ অংশের উন্নতি সাধনের এবং কোন্ কোন্ অংশের প্রতিসংস্কারের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। আধুনিক বিজ্ঞান শাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ব্যক্তিগণ যদি কৃপা করিয়া সে বিষয়ে মনঃসংযোগ করেন তাহা হইলে দেশের প্রভূত মঙ্গল হইতে পারে।

প্রথমতঃ আয়ুর্ব্বেদের ঔষধ-স্কন্ধের উন্নতি অতীব প্রয়োজনীয়। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ঔষধ-রত্নের অসদ্‌ভাব নাই। তজ্জন্য পরের দ্বারস্থ হইবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু নানা কারণে আবশ্যকানুরূপ ঔষধ তৈয়ার করিবার উপায় নাই। যে যে উপায় অবলম্বন করিলে প্রয়োজনীয় উদ্ভিদ, খনিজ এবং জান্তব ঔষধ দ্রব্য সমস্ত চিনিতে পারা যায়, আর যে উপায়ে সেই সকল দ্রব্য অবিকৃত অবস্থায় অনায়াসে পাওয়া যায় তাহার উপায় সর্ব্বাদৌ করা কর্ত্তব্য।

আয়ুর্ব্বেদের উপদেশ অনুসারে ঔষধ প্রস্তুতির সুকৌশল শিক্ষার উপায় উদ্ভাবন করা দ্বিতীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

তৃতীয়তঃ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার যে অংশ (শল্যতন্ত্র, শালাক্যতন্ত্র প্রভৃতি) পরিত্যক্ত হইয়াছে, যাহাতে সেই সেই অংশের সুচিকিৎসা পুনঃ সুপ্রচলিত হয় তাহার উপায় বিধান।

চতুর্থতঃ আয়ুর্ব্বেদের শারীর স্থানের প্রতিসংস্কার।

পঞ্চমতঃ আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার সুপ্রচলন।

যদি দেশের কৃতি সন্তানগণ এই সকল কাজ করিতে পারেন, তাহা হইলে অচিরে দেখিতে পাইবেন যে, আমাদের জাতীয় আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র পৃথিবীর সমস্ত চিকিৎসা বিজ্ঞানের শীর্ষস্থানে দাঁড়াইয়া অমৃত ধারা বর্ষণ করিতেছে।

পূর্ব্বে নব্য শিক্ষিতের মুখে শুনিতাম যে, হিন্দুর ধর্ম্ম অতি জঘন্য; এক্ষণে শুনিতেছি আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অবৈজ্ঞানিক। যতই অনুসন্ধান হইতেছে ততই জানা যাইতেছে যে হিন্দু ধর্ম্মের ন্যায় সনাতন ধর্ম্ম পৃথিবীতে নাই যদি যদি ধর্ম্মানুসন্ধিৎসু-মহাত্মগণের ন্যায় আয়ুর্ব্বেদানুসন্ধিৎসু নব্য শিক্ষিতের আবির্ভাব হয়, তাহা হইলে জানিতে পারা যাইবে যে, আয়ুর্ব্বেদের ন্যায় উৎকৃষ্ট চিকিৎসা শাস্ত্র কোন দেশে আবিষ্কৃত হয় নাই।

শ্রীযুক্ত নিয়োগী মহাশয়, আধুনিক উপায়ে লৌহাদি ভস্ম করিয়া অল্প মূল্যে বিক্রয় করতঃ দরিদ্রের আশীর্ব্বাদ কুড়াইতে বসিয়াছেন। সহৃদয়ের কথার মত কথা বটে। ঔষধের মূল্য বাবদে এদেশের লোককে এদেশীয় চিকিৎসকদিগকে যাহা দিতে হয় তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর। দুই চারি জন ভ্যাওার অব্ মেডিসিনের মূল্য নিরূপণ তালিকা দেখিয়া আর দুই চারিজন অতি লোভী কবিরাজের কর্ম্ম দেখিয়া নিয়োগী মহাশয় শিহরিয়া উঠিয়াছেন। অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন যে, দেশের লোক কত অল্পব্যয়ে আয়ুর্ব্বেদ মতে চিকিৎসিত হন। এদিকে প্রতিবারে

ডাক্তারেরা ১৬৲ টাকা ৩২৲ টাকা ভিজিট্‌ লইতেছেন। রোগ আরোগ্য করিতে অসমর্থ হইলে স্থান পরিবর্ত্তন করাইয়া এই দরিদ্র দেশের মহা সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন, তদ্বিষয়ে নিয়োগী মহাশয় একটুও বাঙ্‌নিষ্পত্তি করেন নাই কেন তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

চিকিৎসা বৃত্তি।

স্বাধীন বৃত্তির যতগুলি পথ প্রশস্ত আছে, তন্মধ্যে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার মত আর কোন পথই নহে। চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার ফলে এক সঙ্গে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—চতুর্ব্বর্গ লাভ, সম্মান এবং প্রতিপত্তির অর্জ্জন যেরূপ হইয়া থাকে,—এমন আর কোন বৃত্তিতে নহে। একজন অধিক বেতনের সম্মানাস্পদ কর্ম্মচারী বা একজন স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বী অন্য ব্যবসায়ী কখন কোন প্রয়োজনে রাজন্যবর্গের নিকট উপস্থিত হইয়া ইঙ্গিত বিষয়ের আলোচনা করিতে কুণ্ঠিত হইতে পারেন, কিন্তু বিশেষ প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন চিকিৎসক না হইলেও শুধু চিকিৎসক আখ্যা লইয়াই রাজ সদনে উপস্থিত হইতে কোন চিকিৎসকের সাহসে আটকাইবেনা,—অন্য ব্যবসায়ের সহিত চিকিৎসা বৃত্তির ইহাই বিশেষত্ব। চিকিৎসক গরীব হইলেও তাঁহার আদর সকল ব্যবসায়ী অপেক্ষা অধিক। সুতরাং এই জাতীয় জাগরণের দিনে দেশের স্বাধীন চেতা যুবকগণের যে এই বৃত্তি পরিগ্রহ করা একান্ত কর্ত্তব্য তাহাতে আর দ্বিধা করিবার কিছুই নাই।

কিন্তু সর্ব্ব সাধারণের পক্ষে চিকিৎসা শিক্ষার পন্থা সুগম নহে। পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞান শিখিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট যে কয়টী স্কুল ও কলেজের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, সেই গুলিতে প্রবেশ করিতে হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া চাই। গবর্ণমেণ্টের মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করিতে হইলে আই, এস, সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া চাই—ইহাই আইন, কিন্তু অনেকেই আই, এস, সি পাস করিয়াও সেখানে প্রবেশ করিতে পারেন না। ক্যাম্বেলে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করিলে প্রবেশ করিতে পারা যায়—আইনে এইরূপ লেখা থাকিলেও ফলতঃ অনেক ম্যাট্রিক ছাত্রও সেখানে প্রবেশ করিতে পারে না।

ইহা ভিন্ন পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিদ্যালয় গুলিতে যে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা শুধু পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সম্মত। এজন্য দেশের লোকে যদি পাশ্চাত্য বিদ্যায় জ্ঞানার্জ্জন করিয়া চিকিৎসক প্রস্তুত হয়, তাহা হইলে তদ্দারা দেশের উপকার যে পরিমাণ হইবে, তাহাপেক্ষা অধিক উপকার হইবে—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় বিদ্যায় পারদর্শী চিকিৎসকের নিকট। প্রাচ্য চিকিৎসা শাস্ত্রই চিকিৎসা শাস্ত্রের আদি সম্পত্তি। লোক পিতামহ ব্রহ্মা এই প্রাচ্য চিকিৎসা শাস্ত্রের স্রষ্টা। তাঁহার নিকট হইতে দক্ষ প্রজাপতি, দক্ষ প্রজাপতির নিকট হইতে

ইন্দ্র এবং ইন্দ্রের নিকট হইতে এই বিদ্যা ত্রিকালদর্শী মহর্ষিবৃন্দ আয়ত্ত করিয়াছিলেন। কালক্রমে সেই মহর্ষিবৃন্দের আয়ত্ত বিদ্যা আরব, গ্রীস, তুরস্ক, ইংলণ্ড—সমগ্রদেশে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে এবং পাশ্চাত্য দেশের পণ্ডিতগণ সেই বিদ্যার অনুশীলনে এরূপ উন্নত হইয়া পড়িয়াছেন যে, মূলতঃ যাঁহারা এই বিদ্যার প্রথম প্রচারকর্ত্তা, তাঁহারা পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের অর্জ্জিত বিদ্যার ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন না।

ফলতঃ পাশ্চাত্যবিজ্ঞানের প্রথম গুরু আয়ুর্ব্বেদের ঋষিগণ হইলেও এক্ষণে শারীরস্থানের চিকিৎসায় তাঁহারা এত উন্নত হইয়াছেন যে, তাঁহারা এক্ষণে "গুরুর অধীত বিদ্যা শিখা'ব গুরুরে" এ অহঙ্কারের ন্যায্য অধিকারী। শারীরস্থানের চিকিৎসায় মৃতদেহে জীবন দান ভিন্ন তাঁহারা আর সকলই করিতে সমর্থ। এক কথায় অ্যানাটমী এবং সার্জ্জারির অনুশীলনে পাশ্চাত্যবিজ্ঞান এখন এত উন্নতি করিয়াছে যে, তাহারই জন্য সনাতন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক অনেক ক্ষেত্রে তাঁহাদের নিকট পরাভব মানিয়া থাকেন। নতুবা আয়ুর্ব্বেদের চিকিৎসা-প্রণালী যেরূপ সুন্দর এবং দেশের লোকের ধাতু ও প্রকৃতি অনুসারে—এই চিকিৎসা প্রণালী তাহাদের নিকট এত কার্য্যকারী যে, আয়ুর্ব্বেদ হইতে যদি ইদানীন্তন কালে শল্যচিকিৎসার বিলুপ্তি না ঘটিত, তাহা হইলে—আর্য্য চিকিৎসার সহিত এ চিকিৎসায় আর তুলনাই হইত না।

কলিকাতার অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ এ কথাটি অনেকদিন হইতেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং কলিকাতা নগরীতে গত ৬ বৎসর পূর্ব্বে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় বা আয়ুর্ব্বেদ মেডিকাল কলেজের প্রতিষ্ঠা তাহারই ফলসম্ভূত। আয়ুর্ব্বেদের সকল গ্রন্থগুলি ইহারা যথারীতি শিক্ষাদান করিয়া তৎসহ শারীরবিদ্যা ও শল্যতন্ত্রের শিক্ষা ইহারা কৃতবিদ্য ডাক্তারদিগের উপর অর্পণ করিয়াছেন। কেমিষ্ট্রি বা রসশাস্ত্রের, ফিজিক্স বা পদার্থবিদ্যার শিক্ষা, বোটানি বা উদ্ভিদ বিদ্যার শিক্ষাও ইহারা এইরূপভাবে ঐ সকল পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিশারদদিগের উপর অর্পণ করিয়াছেন। এই জন্য চিকিৎসা শিক্ষার্থিগণের পক্ষে এই বিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রণালী যে অতি উৎকৃষ্ট—তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ এক দিকে নাড়ী দেখিয়া বায়ু, পিত্ত ও কফের বিকৃতি-বৈষম্য উপলব্ধি করিয়া যেরূপ কায়চিকিৎসায় সাফল্য লাভ করিতেছে, অপর দিকে সেইরূপ শল্যতন্ত্রের জ্ঞানার্জ্জনে মানবদেহের ব্রণের ছেদন, রোপন, উৎসাদনের ব্যবস্থায় কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারিতেছে। ধাত্রী-বিদ্যার শিক্ষাও এই বিদ্যালয়ে আয়ুর্ব্বেদের ধাত্রী-বিদ্যার অধ্যাপনা ভিন্ন কৃতবিদ্য ডাক্তার দিগের উপর পাশ্চাত্য পদ্ধতি অবলম্বনেও শিখাইবার ব্যবস্থা আছে। সেই জন্য এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের ধাত্রীবিদ্যা অর্থাৎ সন্তান প্রসব করাইবার উপায় প্রভৃতিতেও অভিজ্ঞতা লাভ ঘটিয়া থাকে। এক কথায় এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ যে পদ্ধতিতে শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে,—প্রকৃত চিকিৎসক গঠনের জন্য তাহাই সমীচীন। ইদানীন্তন কালে যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির জন্য সচেষ্ট, তাঁহারা ইহার উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিয়া সর্ব্বতোভাবে

ইহারই পন্থানুসরণ করুন,—দেখিবেন অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় প্রবর্ত্তিত শিক্ষাপদ্ধতির গর্ব্ব লইয়া দেশের আয়ুর্ব্বেদাধ্যায়ী ছাত্রগণ সমগ্র বিশ্ববাসীর নিকট যুগান্তর উপস্থিত করিতে সমর্থ হইবে, আয়ুর্ব্বেদের উন্নতিকামী আচার্য্য গণের সদুদ্দেশ্য সর্ব্বপ্রকারে সাফল্য লাভ করিয়া আবার সেই চরক-সুশ্রুতের যুগের মত নবপ্রবর্ত্তিত যুগের আলোকে সমগ্র সংসার আলোকাকীর্ণ করিয়া তুলিবে। তুমি আমি আয়ুর্ব্বেদ বৃত্তি অবলম্বিগণ এ কথা যে বুঝিনা তাহা নহে, কিন্তু বুঝিলেও অনেক কারণে মুখ দিয়া অনেক সময় ফুটিতে চাহিনা, কিন্তু বুকে হাত দিয়া সত্য কথা বলিতে হইলে এ কথা তো জোর করিয়া বলিতে হইবে যে, শারীরস্থানের শিক্ষালাভ ভিন্ন শরীরিদিগের চিকিৎসা কার্য্যে হস্তক্ষেপ করাই কর্ত্তব্য নহে, —শারীর স্থানের শিক্ষালাভ না করিয়া যাঁহারা শরীরিদিগের চিকিৎসায় হস্তক্ষেপ করেন— তাঁহাদিগের চিকিৎসা অনেক সময় অন্ধকারে লোষ্ট্রনিক্ষেপের অনুরূপ হইয়া থাকে। সুতরাং বৃথা অহমিকার গর্ব্বে আমাদিগের আর আস্ফালন করা কর্ত্তব্য নহে। সেই জন্য বলিতেছি, দেশ জাগিয়াছে, দেশের অধিকাংশ ব্যক্তিই নিজ নিজ কর্ত্তব্যপথ চিনিতে সক্ষম হইয়াছে,—বৈদ্য চিকিৎসক! তুমিও এ সময় পন্থা নির্দ্দেশ পূর্ব্বক জাতীয় কর্ত্তব্য পালনে প্রস্তুত হও,—অহমিকার অন্ধকারে আর অবস্থিত না থাকিয়া তোমরা ঋষিমুখ নিঃসৃত চিকিৎসার প্রচার কার্য্যে কায়মনোপ্রাণ সকলই নিয়োজিত কর,—চিকিৎসার সকল সূত্রই ঋষিমুখ নিঃসৃত হইলেও যে গুলির অনুশীলন তুমি বহুবৎসর না করার ফলে ভুলিয়া গিয়াছ,—যাঁহারা সে গুলির অনুশীলনে উন্নত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট হইতে সেগুলি আয়ত্ত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হও, দেখিবে—তোমার প্রাণান্তকর পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে, তুমি জ্ঞানগর্ব্বে সত্য সত্য আচার্য্য পদের প্রকৃত অধিকার লাভ করিয়া বিশ্বজগতে বিজয় কীর্ত্তিলাভে সমর্থ হইয়াছ।

আমরা বাঙ্গালা দেশের চিকিৎসক। বঙ্গ জননীকে আধিব্যাধির হস্ত হইতে রক্ষা করা আমাদের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্টের রিপোর্টে প্রকাশ, বাঙ্গালার প্রতি ১ লক্ষ পুরুষের মধ্যে ৭১,৫০০ জন লোকের ৪০ বৎসর বয়স পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই মৃত্যু হইয়া থাকে, প্রতি লক্ষে ৮৫,০০০ জন ৫০ বৎসর বয়সের পূর্ব্বেই মৃত্যু মুখে পতিত হয়। বাঙ্গালা দেশে যত শিশু জন্ম গ্রহণ করে, তাহার এক চতুর্থাংশ শিশু এক বৎসর পূর্ণ হইতে না হইতেই পরপারের যাত্রী হইয়া থাকে। হাজার করা ১৫০ হইতে ১৭৫ টি শিশু এক মাস বয়স হইবার পূর্ব্বেই জীবন লীলা সম্বরণ করে। এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতেই বাঙ্গালা দেশের অবস্থা যে কি ভীতিসঙ্কুল তাহা অনুমেয়। আমাদের বাঙ্গালা দেশের চিকিৎসক মণ্ডলীর কি প্রথম কর্ত্তব্য নহে—ইহার প্রতীকারের উপায় চিন্তন? প্রতীকারের উপায় কি চিন্তা করিতে হইলে কেন এই মৃত্যুসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে তাহার চিন্তা করিতে হইবে। গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে দেশে স্বাস্থ্যকর্ম্মচারীর নিয়োগে দেশরক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে, আগে যখন এ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয় নাই তখন দেশের মৃত্যুসংখ্যা এতটা তো ছিলনা। কাজেই স্বীকার করিতে হইবে, পূর্ব্বাপেক্ষা বাঙ্গালায়

এত রোগবৃদ্ধি হইয়াছে যে, স্বাস্থ্য কর্ম্মচারিগণের ঐকান্তিক চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁহারা রোগ রাক্ষস দিগকে আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছেনা। বাঙ্গালার চিকিৎসক মণ্ডলীর কর্ত্তব্য তাঁহাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করা। কিন্তু বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রধান ব্যাধি ম্যালেরিয়া নিবারণের যে ব্রহ্মাস্ত্র পাশ্চাত্য দেশের চিকিৎসকগণ আমাদিগের সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহাই হইয়াছে বাঙ্গালার সমগ্র চিকিৎসকের ম্যালেরিয়া নিবারণের ব্রহ্মাস্ত্র। সত্য কথা বলিতে কি, অনেক আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক পর্য্যন্ত তাঁহাদের ঔষধাদির কথা ভুলিয়া গিয়া ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য অনেক সময় এই কুইনাইনেরই শরণ গ্রহণ করিয়া থাকেন। ফলে কুইনাইনে সহসা জ্বর বন্ধ হয় সত্য, কিন্তু ইহার ফল স্থায়ী হয়না, কাজেই বাঙ্গালী পুনঃ পুনঃ ম্যালেরিয়ার আক্রমণে বলশূন্য হইয়া থাকে। বাঙ্গালীর মরণাধিক্যের ইহাই হইল সর্ব্বপ্রধান কারণ।

আয়ুর্ব্বেদ ব্যবসায়ী চিকিৎসকগণের কি কর্ত্তব্য নহে যে, এই কুইনাইনের পরিবর্ত্তে তাঁহাদের যে সকল অমূল্য রত্ন আয়ুর্ব্বেদে নিহিত রহিয়াছে জন সমাজে তাহার প্রচারের ব্যবস্থা করা? বাঙ্গালার মৃত্যুর হার কমাইতে হইলে বাঙ্গালীকে এখন অন্যান্য ব্যবসায়ে মনোভিনিবেশ না করিয়া চিকিৎসা বৃত্তি অবলম্বনের জন্য অধিক মনোযোগী হইতে হইবে, কিন্তু সে চিকিৎসা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সমন্বয়ে সাধিত হওয়া চাই—ইহাও বাঙ্গালীকে মনে রাখিতে হইবে। ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য ডাক্তারদিগের কুইনাইন আমরা স্পর্শ করিব না, কিন্তু যেখানে শস্ত্র প্রয়োগ না করিলে রোগীর প্রাণবিয়োগের সম্ভাবনা, সেখানে শস্ত্র প্রয়োগ করিবার জন্য ডাক্তারদিগের নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিব—ইহাই হইল সুচিকিৎসক হইবার প্রকৃষ্ট উপায়। তুমি আমি একথা না বুঝিলেও ডাক্তারেরাও এ কথা এক্ষণে বুঝিয়াছেন এবং সেজন্য অনেকে ডাক্তারি ডিগ্রি লইয়াও অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতেছেন। এই জাতীয় জাগরণে প্রত্যেক বৈদ্য চিকিৎসক যদি এ সকল কথা চিন্তা করেন—তাহা হইলে লুপ্ত প্রায় আয়ুর্ব্বেদের যুগ আবার যে শীঘ্র ফিরিয়া আসিবে তাহা অবিসংবাদিত।

আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা।

[হিতবাদী-সম্পাদক লিখিত]

—:০:—

মহাত্মা গান্ধির সহযোগিতা বর্জ্জন আন্দোলনে বঙ্গদেশের অনেক ছাত্র কলেজ পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইহারা ভবিষ্যৎ জীবনে স্বাধীন ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন বলিয়া "গোলাম-খানার" সম্বন্ধ ত্যাগ করিতেছেন। যাহাতে স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে, অথচ

দেশমাতৃকার সেবাও চলিতে পারে, এমন কোনও বিষয় শিক্ষা করিবার জন্য অনেকেরই আগ্রহ আছে। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা আমাদের দেশের জাতীয় চিকিৎসা। এই চিকিৎসা প্রণালী উন্নত বিজ্ঞানসম্মত এবং ইহার রোগ আরোগ্য করিবার ক্ষমতাও অসাধারণ। ইহাতে পাচন মুষ্টিযোগ, চরকোক্ত ভেষজ-বিধান, তন্ত্রোক্ত রসচিকিৎসা, সুশ্রুতোক্ত কায়চিকিৎসা, ব্রণ চিকিৎসা ও শল্য চিকিৎসা প্রভৃতি নানাবিধ ফলপ্রদ চিকিৎসা পদ্ধতি বর্ত্তমান। আমাদের দেশে ক্রমেই আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকের সংখ্যা হ্রাস পাইয়া আসিতেছে। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় বিজাতীয় শিক্ষার ফলে অনেকে বিশ্বাস হারাইয়া বসিয়াছেন। অনেকে ব্যবসাদারী কবিরাজের ধূর্ত্ততায় ইহার উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়াছেন। অথচ দেশীয় গাছগাছড়ায় দেশবাসীর এমন উপযুক্ত সুফলপ্রদ ও বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা প্রণালী যদি লোপ পায়, তবে ভারতবাসীর একটী মহান গৌরবের বিষয় চিরকালের জন্য লুপ্ত হইবে। আমাদের বিশ্বাস, জাতীয় কল্যাণের জন্য আয়ুর্ব্বেদের অধ্যয়ন অধ্যাপনার বিস্তৃতি আবশ্যক। ইহার ঔষধ প্রস্তুত প্রণালীর বৈজ্ঞানিক ভাবে আলোচনা হওয়া উচিত। যাহাতে এই চিকিৎসা প্রণালী গ্রামে গ্রামে বিস্তৃত হয়—তজ্জন্য প্রত্যেক দেশপ্রাণ ভারতবাসীর চেষ্টা না করিলে তাঁহাকে কর্ত্তব্য পথ-চ্যুত হইতে হইবে।

সমস্ত দেশে ব্রাহ্মী, নিম, চিরেতা, কণ্টিকারী, ওলট কম্বল, ক্ষেতপাপাড়া, গুলঞ্চ, বাকস, ভৃঙ্গরাজ, ব্রহ্মযষ্টি, শালপর্ণী, মণ্ডুকপর্ণী (থুলকুড়ি), অনন্তমূল, হরীতকী, আমলকী, আদা, পিপুল, কালমেঘ, যমানী, গন্ধভাদুলে, আকন্দ, ঝিন্টি, পুনর্ণবা, অশ্বগন্ধা, বেড়েলা ইত্যাদি অসংখ্য ভেষজ বর্ত্তমান। ইহাদের প্রত্যেকটির নানা প্রকার রোগনাশক শক্তি আছে। পাশ্চাত্য মতে ইহাদের অনেকগুলির নির্য্যাস বাহির করিয়া ডাক্তারেরা পর্য্যন্ত ব্যবহার করিতেছেন। আয়ুর্ব্বেদের ঔষধ নির্ব্বাচন প্রণালী ও চিকিৎসা প্রণালী আজও পর্য্যন্ত কোনও চিকিৎসা-প্রণালীর নিকট পরাজিত হয় নাই।

ইহার তৈল্য, ঘৃত, মোদক, অরিষ্ট, আসব, নস্য, প্রলেপ ইত্যাদি নানা জাতীয় ঔষধ চিকিৎসা কার্য্যে আশ্চর্য্য রূপে ফলপ্রদ। আমরা দেখিয়াছি যেখানে বড় বড় ডাক্তারি চিকিৎসক পরাজিত হইয়াছেন, সেখানে কবিরাজ মহাশয় অনায়াসে রোগ আরোগ্য করিয়াছেন। ইহার রোগনির্ণয়-প্রণালীও অতি উৎকৃষ্ট বিজ্ঞানসম্মত। আমাদের মতে বহু ছাত্রের এই আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা প্রণালীতে পারদর্শিতা লাভ করা উচিত। প্রত্যেক জেলায়, মহকুমায়, গ্রামে আজকাল আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকের সংখ্যা অতি মাত্রায় হ্রাস হইয়া আসিতেছে। এই সময়ে এই চিকিৎসা প্রণালীর রক্ষণের ও বিস্তৃতির বিশেষ প্রয়োজন। যাঁহারা প্রকৃত স্বদেশপ্রাণ, তাঁহাদের আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা-প্রণালীর পক্ষপাতী হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

ইহার শারীরতত্ত্ব বিভাগ এবং অস্ত্র-চিকিৎসা পদ্ধতি প্রায় লুপ্ত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমাদের মধ্যে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিরও ধারণা যে আয়ুর্ব্বেদে ঐ দুইটি বিষয় একেবারে নাই। অধুনা উপযুক্ত

চিকিৎসকের অভাবে উহা লুপ্ত হইতে বসিয়াছে। আবার যদি এক্ষেত্রে শক্তিশালী কর্ম্মবীরের আবির্ভাব হয়, তবে উহার পুনরুদ্ধার হইবে। অতএব এই ক্ষেত্রে একনিষ্ঠ সাধক চাই। আমাদের মতে প্রত্যেক দেশবাসীর অল্প বিস্তর যতটুকু হউক এই চিকিৎসা প্রণালীর একটু জ্ঞান থাকা উচিত। প্রত্যেককেই শরীর লইয়া বসবাস করিতে হয়। শরীরের ভাল-মন্দ, সুখ, দুঃখ নিরাকরণ সম্বন্ধে একটু স্বাধীনতা থাকিলে তাহাতে উপকার ভিন্ন অপকার হয় না। বঙ্গদেশের প্রাচীনা গৃহিনীগণ আমাদের দেশের শিশুরোগ ও সামান্য রোগ চিকিৎসায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। একশত বৎসর পূর্ব্বে আমাদের দেশে ডাক্তারি চিকিৎসার একরূপ প্রচলন ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, কিন্তু তখন আমাদের দেশে রোগ এত কম ছিল যে, শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। তখনকার মত সবলদেহ, সুস্থ শরীর ও দীর্ঘজীবী লোক এখন সহস্রের মধ্যেও একজন পাওয়া যায় না। চিকিৎসাবিভ্রাট যে আমাদের দেশে রোগবৃদ্ধির ও জাতীয় শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক অবনতির অন্যতম কারণ, ইহা নিরপেক্ষ বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন।

আমাদিগকে মরণের পথ হইতে জীবনের পথে ফিরিতে হইলে আমাদের দেশের যাহা মঙ্গলজনক, যাহা সত্যমূলক—তাহার প্রত্যেকটীর নিরপেক্ষ অনুসন্ধান করিতে হইবে। ধীরভাবে বিচার করিয়া যাহাতে প্রত্যেক কল্যাণজনক স্বদেশীয় কলাবার্ত্তা ও চিকিৎসাপ্রণালীর পুনরুদ্ধার হয় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

কোনও স্বদেশপ্রাণ মহাত্মা এখনও এ সম্বন্ধে ঐকান্তিক চেষ্টা করেন নাই। ধনশালী দেশবাসিগণ এখনও এদিকে মনোযোগী হন নাই। শিক্ষার্থী ছাত্র সমাজ এখনও কবিরাজী শিক্ষায় প্রতি সমধিক শ্রদ্ধাশীল হন নাই, আমাদের মতে বর্ত্তমান সহযোগিতা বর্জ্জন আন্দোলনে যাহারা কলেজ ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে বহু ছাত্রই এই আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন ও ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা করিতে পারেন। ইহাতে দেশেরও কার্য্য হইবে অথচ ইহারাও উপযুক্ত সম্মান সহকারে স্বাধীনভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া সুখী ও যশস্বী হইতে পারিবেন। আমরা এদিকে দেশপ্রাণ নেতৃগণের ও ছাত্রমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

কায়চিকিৎসা ক্রমোপদেশ বা

Practice of medicine.

(পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর হইতে)

—:*:—

সূচিভিরিব গাত্রাণি তুদন সন্তিষ্ঠতে হুনিলঃ।
যত্রাজীর্ণে সা বৈদ্যৈ র্বিসূচিতি নিগদ্যতে॥

অজীর্ণ হেতু যদি রোগীর শরীরে সূচি-বিদ্ধ বৎ বেদনা জন্মাইয়া বায়ু অবস্থিত করে, তাহা হইলে বৈদ্যগণ তাহাকে বিসূচিকা রোগ বলিয়া থাকেন।

মূর্চ্ছাতিসারৌ বমথুঃ পিপাসা শূলং ভ্রমোদ্বেষ্টন জৃম্ভদাহাঃ।
বৈবর্ণ্য কম্পৌ হৃদয়ে রুজশ্চ ভবন্তি তস্যাং শিরসশ্চ ভেদঃ॥

বিসূচিকা রোগে মূর্চ্ছা, অতিশয় মল ভেদ, বমি, পিপাসা, শূল, ভ্রম, হস্ত ও পদে খাল ধরা এবং হাইতোলা, দাহ, শরীরের বিবর্ণতা, কম্প, হৃদয়ে বেদনা ও শিরঃ শূল হইয়া থাকে।

বিসূচিকার সাধারণ চলিত নাম ওলাউঠা এবং ইংরাজী নাম কলেরা। তবে এই রোগ আগে খুব কমই হইত, তাহার কারণ দেশের লোক তখন স্বাস্থ্যরক্ষার বিধি-নিষেধ সকল মানিয়া চলিতেন, আর এখন তাহার অভাবে এ রোগ ভীষণ ভাবে দেশের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে—তাৎকালিক বিসূচিকা বা এখনকার কলেরার মধ্যে এই যা' প্রভেদ।

ইয়ুরোপীয় চিকিৎসকগণ এই ব্যাধিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, ব্রিটিশ ও এসিয়াটিক। ইয়ুরোপীয় চিকিৎসকদিগের মধ্যে আবার যাঁহারা এলোপ্যাথ, তাঁহারা আবার ইহাকে তিন ভাগে বিভক্ত করেন, যথা (১) বিলিয়াস বা পৈত্তিক (২) ফ্লাটু-লেণ্ট বা বাতিক এবং স্প্যাজমোডিক্ বা সান্নিপাতিক। আয়ুর্ব্বেদ মতে বিসূচিকা—বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা এই ত্রিবিধ কারণ হইতে উদ্ভূত। ইয়ুরোপীয় চিকিৎসকগণ এই রোগকে যে কলেরা নাম দিয়াছেন, তাহা প্রাচীন গ্রীক শব্দ "কোলে" হইতে উৎপন্ন। 'কোলে' শব্দের অর্থ পিত্ত।

সকল প্রকার কলেরার মধ্যে এসিয়াটিক কলেরা অতি ভয়ঙ্কর—ইহা সাংঘাতিক। আয়ুর্ব্বেদের "বাতোল্বন সন্নিপাতের" সহিত ইহার সাদৃশ্য দেখা যায়। এই এসিয়াটিক কলেরা সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষেই দেখা দিয়াছিল। নদীয়া, যশোহর প্রভৃতি জেলায় ইহা প্রথম আবির্ভূত হইয়া সমগ্র ভারতবর্ষে—ক্রমে সমগ্র ইয়ুরোপ খণ্ডে বিস্তারিত হইয়া পড়ে। এই এসিয়াটিক কলেরা আক্রান্ত রোগীর জীবনের আশা করা যাইতে পারে না।

জর্ম্মাণ ডাক্তারদিগের মতে "কমা ব্যাসিলি" বা জীবাণু হইতে এই রোগ মানব শরীরে জন্মিয়া থাকে। এই জীবাণুগুলির অবস্থিতি

স্থান জলাশয়। কলেরার প্রাদুর্ভাবের সময় এই জন্যই পানীয় জল উষ্ণ করিয়া পান করা উচিত।

আয়ুর্ব্বেদকারগণ অজীর্ণ হইতে এই রোগের উৎপত্তির কথা বলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এমনও দেখা গিয়াছে, অজীর্ণ বা উদরাময় না হইয়াও অনেকে এই রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে।

যুগপৎ ভেদ ও বমন এই রোগের সাধারণতঃ লক্ষণ। দুই একবার এইরূপ হইতেই চক্ষু কোটরাগতও নীলবর্ণ হইয়া পড়ে। প্রথমে অতীসারের ন্যায় মলভেদ ও সাধারণভাবে বমন হইয়া তাহার পরে জলবৎ বা পচা কুমড়ার কাথের ন্যায় মলভেদ এবং জল বমন হইতে থাকে। রক্তভেদও কখনো কখনো দেখা যায়। উদরে অসহ্য বেদনা, হস্তপদাদিতে খালধরা, হস্তপদ শীতল ও সংকুচিত—এই সকল লক্ষণ ক্রমশঃ উপস্থিত হইয়া থাকে। হিক্কা, পিপাসা, মোহ, ভ্রম—এই সকল লক্ষণও ক্রমশঃ দেখা দেয়। স্বরভঙ্গ এই রোগের একটি বিশেষ কুচিহ্ন।

এই ভয়ঙ্কর ব্যাধি প্রায়শঃ শেষ রাত্রে কখন বা প্রাতঃকালেও আক্রমণ করিয়া থাকে শেষ রাত্রের আক্রমণ প্রায়ই সাংঘাতিক।

এই রোগ উপস্থিত হইবামাত্র চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত। প্রথমে একেবারে মল রোধক ধারক ঔষধ না দিয়া অল্প অল্প মাত্রায় ধারক ঔষধের ব্যবস্থা করিবে। অজীর্ণজনিত বিসূচিকায় মহারাজ নৃপতিবল্লভ এবং চিত্রকাদি গুড়ি যাহা গ্রহণী অধিকারে বলা হইয়াছে, তাহা বিশেষ উপযোগী। কেবলমাত্র 'চিত্রকাদি গুড়ি' ব্যবস্থা করিয়া আমি এক সময়ে অজীর্ণ হেতু বিসূচিকাগ্রস্তা একটী রোগিণীকে আশ্চর্য্যরূপে আরোগ্য করিয়াছিলাম। কিন্তু যদি বিসূচিকা অজীর্ণ জন্য না হয়, তাহা হইলে ঐ দুইটি ঔষধে ফল হইবে না। সে অবস্থায় মুস্তাস্থবটীকা বা কর্পূর বটীর প্রয়োগ করিবে। নিম্নে ঐ ঔষধ দুইটির পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

মুস্তাস্থ রস।

মুতা ১ তোলা, পিপুল, হিঙ্গু ও কর্পূর — প্রত্যেক অর্দ্ধ তোলা। সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশাইয়া জলের সহিত বাটিয়া ২ রতি প্রমাণ বটি. অনুপান আতপ চাল ধোয়া জল।

কর্পূর রস।

হিঙ্গুল, অহিফেন, মুতা, ইন্দ্রযব, জায়ফল ও কর্পূর—সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশাইয়া জলের সহিত মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটী। কেহ কেহ ইহাতে ১০তোলা সোহাগার খই মিশ্রিত করেন।

বিসূচিকা রোগ যদি অজীর্ণ জন্য না হয় তাহা হইলে নিম্নলিখিত ঔষধটি প্রস্তুত করিলে উপকার দর্শে।

দারুচিনি ৮০ আনা,
জাকরান ৮০ আনা,
লবঙ্গ ।৶০ আনা,
ছোট এলাইচেরদানা ।৹ আনা,

সমস্ত দ্রব্য পৃথক পৃথক চূর্ণ করিয়া ২৫ তোলা কাশীর চিনির সহিত উত্তমরূপে মিশাইয়া সমস্ত দ্রব্য যত ওজন হইবে, তাহার তিনভাগের একভাগ চা খড়ি চূর্ণ তাহার সহিত মিশাইয়া রোগীর বয়স অনুসারে—১০ রতি হইতে ৩০ রতি পর্য্যন্ত মাত্রায় বারম্বার সেবন করাইবে। বয়স ২০ বৎসরের হইলে ঐ সকল দ্রব্যের পূর্ণ ২০ রতি লইয়া ২ রতি